আবদুর রউফ চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম একজন সারা জাগানো প্রাবন্ধিক। 'বিদ্রোহী' কবি বলে কাজী নজরুল ইসলামের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এতে তার সর্বব্যাপক প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে অতি সামান্য, এক আনার চেয়েও কম, পনেরো আনারও বেশি তার প্রতিভার প্রয়োগ দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনে। সর্বক্ষেত্রে তার পারদর্শীতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান, প্রাণরসে পুষ্ট। নজরুল স্বীয় প্রতিভার আনন্দ-ধারায় বর্ণাঢ্য, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'কাজীর প্রতিভা অষ্টভেদী, গিরিশৃঙ্গে তার স্থিতি, গগনচারী বর্ণাঢ্য লঘুপক্ষ মেঘকে যেমন তার সদা আমন্ত্রণ, ভয়াল বজ্রগর্ভ মেঘের আবির্ভাবেও তেমনি তার শৈলচূড়ায় এনে দেয় বাক্যালাপের আনন্দ সমারোহ। [...] সত্যিকারের বিরাট সাহিত্যস্রষ্টা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অগ্রদূত হিসাবে নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই রাজনীতিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।'

নজরুল ভারতবর্ষের মানুষের কথা ভাবতে গিয়েই সমাজনীতির কথা ভেবেছেন; ভেবেছেন তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তি-উন্নতি-মঙ্গল কামনার সূত্র ধরে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির কথা; তবে তিনি রাজনৈতিক-কর্মী বা পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না; তবুও তাঁর প্রবন্ধের জগৎ নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমে তাঁর সময় ও দেশকে জানা বাঞ্ছনীয়, তাই তাঁর দেশে রাজনৈতিক ধারা (১৯১৭ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত) কেমন ছিল সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোপাত করা আবশ্যক।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে, বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, আর অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য-দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্ম নেয় এক নতুন সমাজব্যবস্থা, সচেতন ভারতবর্ষের মানুষদের দৃষ্টিতে যা রুশবিপ্লব হিশেবে চিহ্নিত হয়, যা প্রতিক্রিয়াশীল এক সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বশক্তির পতন ঘটিয়েছিল। রুশবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ জুড়ে গণ-সংগ্রামের সূচনা ঘটে। কিন্তু পতনোন্মুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আবার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন জরুরি ব্যবস্থাগুলি যুদ্ধাবসানে স্থায়ী আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তাই আইনজীবী মি. রাওলাটের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সোপারিশক্রমে 'ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ'-এ, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের প্রাথমিক অধিকার হরণ করার বাসনায়, 'রাওলাট বিধি'-নামক একটি আইন উত্থাপিত হয়, যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন তীব্রতরকরণের জন্য, ১৮ই মার্চ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন আইন হিশেবে জারি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ব্রিটিশ-সরকারের ঔদ্ধত্যের উত্তরে গর্জে উঠেন নেতৃবর্গ, তাঁরা শুরু করেন বৈঠক, মজলিশ, জনসভা; এই আইনের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয়। যথারীতি ব্রিটিশ-সরকার ভোটের জোরে আইনটি পাশ করিয়ে নেয়। ভারতবর্ষীয় নেতৃবর্গের আহ্বানে, 'রাওলাট

আইন'-এর বিরুদ্ধে, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পূর্ণ-হরতাল পালিত হয় (৬ই এপ্রিল ১৯১৯), কিন্তু হঠাৎ পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডয়ের বিনাকারণে ডা. সাইফ উদ্দিন কিচলু ও ডা. সত্য পাল সর্বজনমান্য জননেতাদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে (৯ই এপ্রিল ১৯১৯) এক অজানা স্থানে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব জুড়ে শুরু হয় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন। ১০ই এপ্রিল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে, হরতাল পালিত হয় পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসরে। শুরু হয় শোভাযাত্রা, একইসঙ্গে চলে পুলিশের গুলিবর্ষণ, তবুও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগে জননেতাদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে, 'বৈশাখি মেলা' উপলক্ষে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯) সহস্র লোকের সমাবেশে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। বিকেল ৪টার সময় জেনারেল ডায়ার একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করলে শত শত নরনারী, শিশুকিশোর, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা প্রাণ হারায়। সরকারী তথ্যানুযায়ী এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মাত্র ৩৭৯জন নিহিত ও ১,৫০০জন আহত হয়, কিন্তু বেসরকারী হিশেবানুসারে নিহতদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এখানেই ব্রিটিশ-সরকার থেমে থাকেনি; সামরিক আইন জারি করে সাংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সভাসমিতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পাঞ্জাবে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে বহির্জগতের সঙ্গে পাঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে সরকার নির্বিকারচিত্তে অত্যাচার-বন্যা অব্যাহত রাখে। এরকম নির্মম অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে তখন লাহোর ও অমৃতসরে লাঠিধারী 'দণ্ডফৌজ' গড়ে তোলা হয়; এমনকী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বনামধন্য হেকিম আজমল খান ব্রিটিশ-সরকার প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদের একমাত্র ভারতবর্ষীয় সদস্য স্যার সি. এস. নায়ারও সদস্যপদ থেকে ইশতেফা দেন।[১]

নভেম্বর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে, গান্ধী সমগ্র ভারতবর্ষের খিলাফৎ কমিটির সভাপতি হিশেবে নির্বাচিত হন। বোম্বে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম খিলাফৎ সম্মেলনে গৃহীত হয় মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'অসহযোগ নীতি' ও মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ নীতি'। সেসময় পদাধিকারবলে তুরস্কের সুলতান মুসলিমবিশ্বের খলিফা ছিলেন। ব্রিটিশ, ইতালি, ফরাসি প্রভৃতি খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশাল তুরস্ক-সাম্রাজ্যকে ভেঙে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে, এবং 'সেভার্স সন্ধি'র শর্তানুসারে খলিফার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মর্যদার উপর বজ্রাঘাত আনা হয়, তাই ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। অবশ্য ভারতবর্ষের অধিবাসী মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন এরসঙ্গে জড়িত ছিল। অন্যদিকে মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলি ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় মুসলমান সৈন্যরা ব্রিটিশের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধফ্রন্টে, বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু 'রাওলাট আইন' জারি ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে ব্রিটিশ-সরকারের নগ্ন দানবীয় মূর্তিটি আত্মপ্রকাশ করলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।

ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে 'অসহযোগ' আন্দোলনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। শুরু হয় 'অসহযোগ' ও 'খিলাফৎ' আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম। প্রসঙ্গত, লোকমান্য তিলক ও সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীই নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেসের ব্রিটিশ-সরকার তোষণমূলক নীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করেন।[২] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত 'অসহযোগ' ও 'খিলাফৎ' আন্দোলনে ভারতবর্ষ জুড়ে 'স্বরাজ অর্জন'-এর এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা হয়; ফলে যখন মিলিত 'খিলাফৎ' ও 'অসহযোগ' আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে তখন উভয় সম্প্রদায়ের কমপক্ষে ৩০ হাজার লোক কারাবরণ করেন। তখনই জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, ভারতবর্ষের ব্যাপক গ্রামঞ্চল হচ্ছে অমিত শক্তির আঁধার, এবং স্বদেশকে মুক্ত করতে হলে গ্রামঞ্চলেই সৃষ্টি করতে হবে ঐক্যবদ্ধ গণবিক্ষোভ, যা ব্রিটিশ-শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে দিতে পারবে সহজেই, তাই গান্ধী গ্রামোন্নয়ন বা পল্লী-সংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমেই আশ্রম স্থাপন করেছিলেন সবরমতিতে, পরে সেবাগ্রামে; তাই তিনি তাঁর কর্ম

[১] আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯।
[২] আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯।

ও আদর্শে গ্রামোন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এমনকী 'অসহযোগ' আন্দোলনের সময় তিনি ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম, নিরন্ন কৃষক এবং বিগতশ্রী কুটির শিল্পের দিকে শিক্ষিত নাগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, 'In my picture of the rural economy the cities would take their natural place.' প্রসঙ্গত, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করে ব্যাপক গণবিক্ষোভকে সাময়িকভাবে সংহতির যন্ত্র হিশেবে প্রয়োগ করে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে নিজের কব্জাগত করেছিলেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, তবে ১৭ই অক্টোবর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সুদূর সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে প্রবাসী ভারতবর্ষীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি। জাতীয়তাবাদী মুসলিম মুহাজিরিনদের অনেকেই তখন রাশিয়াতে গিয়ে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। একই বছর, আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সাম্যবাদের সমর্থক হসরৎ মোহানি ও স্বামী কুমারনন্দ ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন, আর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে কম্যুনিস্টপন্থী শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যদিকে গান্ধী বর্দৌলীতে কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন, তিনি ঘোষণা দেন, 'বর্দৌলী যদি এ-অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে একইসঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে কর বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করা হবে।'[৩] কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে জনসাধারণ ২২জন পুলিশকে অগ্নিসংযোগে হত্যা করলে গান্ধী ঘোষণা করেন যে, এ-আন্দোলন হিংসার পথ ধরেছে। তিনি এ-আন্দোলন প্রত্যাহার করে অহিংসা-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু ও লাজপাৎ রাই গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ-প্রতিবাদ করেন। অন্যদিকে তুরস্কে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণার পর ভারতবর্ষেও খিলাফৎ পন্থীদের মধ্যে উৎসাহের ভাটা পড়তে থাকে। ভারতবর্ষীয় জাতীয় আন্দোলনে অনেক পূর্ব থেকেই নরম ও চরম পন্থী নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় সাময়িকভাবে একতা দেখা গেলেও অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সাম্প্রদায়িক বিভেদ আবারও প্রকট হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লবীরা আবার সন্ত্রাসের পথ ধরতে বাধ্য হন, ফলে দেশব্যাপী শুরু হয় আক্রমণ-সংঘর্ষের রাজনীতি; তাই ২২শে মার্চ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, আসাম প্রাদেশিক পুলিশ কমিশনার ওয়েবস্টার যখন সিলেটের কানাইঘাটে এসে ১৪৪ ধারা জারি করলেন তখন সাধারণ মানুষ অনিবার্য সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি। ২৩শে মার্চ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কানাইঘাটে খিলাফতিদের উদ্যোগে স্থানীয় মাদ্রাসায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ-সরকারের পুলিশবাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে গুলিবর্ষণ করে ঘটনা-স্থলে অনেককে হত্যা করে, তবে ব্রিটিশ-সরকার আট-জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে। আক্রমণ-সংঘর্ষের রাজনীতির ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, নেহেরুসহ চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ পার্টি' গঠনের মাধ্যমে (২১শে ডিসেম্বর ১৯২২)। চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ লাভের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি আমার কার্য্যপদ্ধতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই। যে কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের স্বার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে একটু পশ্চাৎপদ হইব না। সরকারকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি যে, আমাদের অধিকার প্রদত্ত না হইলে আমরা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিব না। সেই জন্য আমরা সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমাদের বাধা প্রদান নীতি চালাইয়াছি। মধ্যপ্রদেশে আমরা আমাদের নীতি চালাইয়া সরকারী শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছি। বাঙ্গলাতেও আমরা ঐ নীতি চালাইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস এখানেও শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে।'[৪] আর জামায়াতের রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক সম্মেলন (১৯২৩, কোকানডায়) থেকে ভারতবর্ষের সর্বাত্মক স্বাধীনতার ঘোষণা ওঠে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত; কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, 'চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল– বিধান পরিষদসহ সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তাদের সংখ্যানুপাতে হবে এবং সমতা লাভ না করা পর্যন্ত সরকারী

[3] আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯।

[৪] দেশবন্ধু রচনাসমগ্র, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

এবং অন্যান্য সংস্থার চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগ করা চলতে থাকবে। দেশবন্ধুর অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও নিপুণ নেতৃত্বের দরুন বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। এই বিরাট প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলার অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন। গান্ধীজীর গণ-আন্দোলন-ভিত্তিক কর্মসূচীর তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেসকে ব্রিটিশ উদার নৈতিক দলের আদর্শে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতামত কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে স্বরাজ দলের প্রতিষ্ঠা করেন।'[৫] ভারতবর্ষের রাজনীতিতে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে), ভারতবর্ষীয় কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্ভবে, ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেসের পত্তনে, ধর্মঘটের অভ্যুদয়ে এবং কৃষক-সভার সংস্থাপনে শ্রমিক-শক্তির উপস্থিতি সুনিশ্চিত হয়। এই শক্তির অভ্যুদয়ের মধ্য-দিয়েই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষীয় জাতীয় আন্দোলনের ভেতর একটি বামপন্থী ধারা আত্মপ্রকাশ করে। বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে, এই সময়ে হিন্দু-মুসলিম স্বার্থের ভেদরেখা রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধ কালক্রমে জাতীয় ঐক্যবিরোধী সাম্প্রায়িক সংঘাতে রূপ নিতে থাকে। তিলক চেয়েছিলেন হিন্দু রাষ্ট্র; কিন্তু গোলওয়াল কার তা চাননি; আর বিপিন পাল উল্লেখ করেন 'কম্পজিট ন্যাশনালিজম'-এর কথা। একদিকে মুসলমান-সম্প্রদায়ের তাঞ্জিম তবলিগ, 'লখনৌ চুক্তি' (যা উত্তরপ্রদেশের মুসলমানদের অনুকুল ছিল কিন্তু বাংলার মুসলমানদের বিপক্ষে), অন্যদিকে হিন্দু-সম্প্রদায়ের শুদ্ধি সংগঠনের তোড়জোড় চলতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাথের্র বিভেদ যখন চরম পর্যায়ে তখন (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতায় সংগঠিত হয় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, সেসময় গভর্ণর জেনারেল ছিলেন আরউইন। জাতীয় জীবনের অন্তরবর্তী নানা দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতায় এইভাবে জাতীয় আন্দোলন মাঝেমধ্যে স্তিমিত হয়ে গেলেও, কখনই তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। কংগ্রেসী নরম ও চরম পন্থী দল, মুসলিম লীগ ও বামপন্থী শ্রমিক শক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলন চালিয়ে যায়। জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তখন অবশ্য তর্কবির্তক চলতে থাকে। ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের মত বাংলাদেশেও 'ওয়ার্কাস এ্যাণ্ড পেজেন্টস্'-নামক একটি কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় এই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেন নজরুলের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল ভারববর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ খুলে দেওয়ার। রাষ্ট্রজীবনে বা সমাজজীবনে সাধারণ মানুষের কল্যাণ আনতে সহজ-সম্ভব নয়, তিনি এও জানতেন যে-সমাজ বা রাষ্ট্র বিপ্লবের সমর্থক নয় সে-সমাজ বা রাষ্ট্রে মুক্তি সহজে আসতে পারে না, তাই তাঁর পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য পন্থাটি হচ্ছে– দেশের মূলশক্তিকে সরাসরি চিহ্নিত করে, বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে, সমাজের মানুষকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। তিনি এও স্পষ্ট জানতেন যে, সুবিধাবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না-পারলে এই মুক্তি আসা অসম্ভবই, বরং সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে সাধারণ মানুষের কোনও মঙ্গল নেই সেখানে দেশের কোনও মঙ্গল থাকতে পারে না; অর্থাৎ, দেশের বিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনে রাজনৈতিক মুক্তি লাভকে ত্বরান্বিত করতে হলে সাশকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিপ্লব করা ছাড়া অন্যকোনও পন্থা নেই; তাই তিনি শাসকগোষ্ঠীর কৃপালাভে জনসাধারণের জীবনকে রাজনৈতিক নিষ্ফল-প্রচেষ্টার মধ্যে বেঁধে রেখে সময় নষ্ট না-করাই উচিত মনে করেছিলেন; তিনি বরং দেশের সাধারণ মানুষের বিপ্লব ঐতিহ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাদেরকে শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন; এই প্রেরণা দান উপযুক্ত বলেও তিনি মনে করতেন। সহায়ক শক্তি হিশেবে এই কাজে যাদের ব্যবহার করা বলে তিনি উচিত মনে করেছিলেন, তারা হচ্ছে দেশের বিপ্লব সমর্থনকারী নবপ্রজন্ম; কারণ, হাজার বছরে গড়ে ওঠা অদৃষ্টবাদী ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, আর্থ-রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সামন্ত-বুজোয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হলে তা একমাত্র সম্ভব হবে যদি নবপ্রজন্মের সাহায্য নেওয়া যায়, তাদের সঠিকভাবে অনুপ্রেরণিত করে জাগিয়ে তোলা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের বিশাল সাধারণ সমাজকে জাগ্রত করা এবং আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে

[৫] পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, কামরুদ্দীন আহমদ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

সাধারণ মানুষকে একটি সংঘর্ষে লিপ্ত করা ছাড়া নজরুলের সামনে আর কোনও বিকল্পপথ ছিল না। নজরুল যেহেতু সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেছিলেন, তাই ত তিনি বলেছিলেন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তি করা বাঞ্ছনীয়। তবে একথাও সত্য যে, নজরুলের দৃষ্টিতে সাধারণ জীবন ও রাজনৈতিক মুক্তির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না, তাই তিনি রাজনৈতিক মুক্তি বলতে বুঝিয়ে ছিলেন সাধারণ মানুষকে ভালোভাবে, খেয়ে-পরে বেঁচে, নিজেকে জেনে, নিজের দেশকে চিনে, নিজের শক্তি দিয়ে নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত করে প্রকৃত মুক্তি লাভ করা। পরাধীনতা থেকে মুক্তির আবর্তন নজরুলের অভিজ্ঞতায় জীবনকে তিলে-তিলে পূর্ণ করে দিয়েছিল, তাই ত তাঁর প্রবন্ধের জগতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার নানাদিক উদ্ভাসিত হয়েছে। নজরুলের ব্যাপ্তি ও বিশালতা যেমন তাঁর প্রবন্ধের জগতে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সাধারণ জীবনের গভীরতা ও মুক্তি লাভ করার পন্থা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপাদানগুলি নিহিত। সাধারণ জীবনের মুক্তি উদ্ঘাটনের জন্য তিনি যে, সাধনায় মগ্ন ছিলেন তারও ফলশ্রুতি পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধের জগতে; তাই তা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সামগ্রিক হয়ে উঠেছে। সাধারণ জীবন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে সীমারেখা যেন মিলে গেছে।

সারা জীবন জুড়ে যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা নজরুলের মধ্যে বীজ আকীর্ণ হয়েছিল তা তাঁর প্রবন্ধের জগতের পরতে পরতে উদভাসিত হয়েছে। সমাজ-চেতনার উন্মেষ ও সমাজনীতি নজরুলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রকল্পে বারবার রূপায়িত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক বিচিত্র চিন্তা ছিল সামগ্রিক; তাঁর রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতির কল্যাণ। নজরুলের দেখানো রাজনীতি যে, ব্যক্তি ও সমাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা ছিল তাঁর ভাবনার প্রকৃত নীতি। রাজনীতি বলতে বিশেষ কোনও প্রক্রিয়াকে তিনি বোঝাননি, বুঝিয়েছেন একটি ক্রম পরিণতিকে; তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়াই হচ্ছে রাজনীতির পরম সামগ্রী, তাঁর প্রবন্ধের জগতে সেই বোধের তপস্যাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে নজরুলের বক্তব্য কী ছিল? তিনি কোন সমাজের, কোন শ্রেণীর মানুষের কথা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে ভেবেছিলেন? নজরুলের সেসব ভাবনার পদ্ধতিই-বা কী ছিল? এসব সন্ধান ও জিজ্ঞাসা যে পটভূমিকায় ও পরিবেশে নজরুল-মানসকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি ছোট আঁকারের বিশ্লেষণ প্রয়োজন; এসবই তুলে ধরার চেষ্টায় নজরুলের প্রবন্ধের জগৎটি রচনা করা হয়েছে, বিভিন্ন তথ্যসহকারে। প্রসঙ্গত, নজরুলে প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হচ্ছে, (১) যুগবাণী (১৯২২); (২) রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩); (৩) দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৫); (৪) রুদ্রমঙ্গল (১৯২৬) ও (৫) ধূমকেতু (১৯৬০)।

যুগবাণী

অক্টোবর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, কাজী নজরুল ইসলামের ভুবনকাঁপানো ও অভূতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। ঠিক একই বছরে, একই মাসে কয়েকদিনের ব্যবধানে 'যুগবাণী' নামে তাঁর আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। রচনা ও প্রকাশের সময়কাল বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এটিই হচ্ছে নজরুলের প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল রাজরোষে পতিত হন। প্রকাশের মাত্র কয়েকদিনের মাথায় ব্রিটিশ-সরকার একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে নজরুল নির্বাক হয়ে যাওয়ার অনেক বছর পরও, ব্রিটিশ-শাসনের শেষপাদ পর্যন্ত। আর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা পেয়েছিলেন যেমন সত্য, তেমনি 'যুগবাণী' গ্রন্থটি প্রকাশের আগেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাঁকে 'রাজবিদ্রোহী' হিশেবে পরিচিত করে। নজরুলের কবিতা নয়, গদ্যগ্রন্থই প্রথম বাজেয়াপ্তের তালিকায় জায়গা করে নেয়, আর সেই থেকে ব্রিটিশ-শাসকের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা তাঁর পিছু নেয়। এই গ্রন্থে এমন কী ছিল যে, যার জন্য ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-সরকার একে বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়?

নজরুল, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, ফজলুল হকের সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'[৬]-এ যোগ দেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁর সাংবাদিকতা শুরু হয়। সাংবাদিকতায় নজরুলের কোনওরকম পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি লিখতে থাকেন। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নজরুল সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নেওয়ার একটি রহস্য জেনে নিয়েছিলেন, বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলী থেকে পদ সংগ্রহ করে ও রবীন্দ্রনাথের পঙক্তিমালার সাহায্যে সংবাদ-শিরোনাম তৈরি করার কৌশল; যেমন– 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' বা 'পরানসখা ফৈসুল হে আমার বা কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দমধুর হাওয়া' বা 'দেখি নাই কভু দেখি না ওগো এমন ডিনার খাওয়া' প্রভৃতি। নজরুলের এই পদক্ষেপ 'নবযুগ' পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এসব আকর্ষণীয় সংবাদ-শিরোনাম এবং সঠিক খবরাখবর নির্বাচনের ক্ষেত্রে নজরুলের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। নজরুল স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন স্বদেশী রাজনীতির মত আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়াদিও। তাঁর সরস, তির্যক, বিদ্রূপাত্মক বাকভঙ্গিতে সংবাদ সত্যই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে; ফলে সাংবাদিকতায় তাঁর সফলতা আসে। তৎকালীন রাজনীতি সচেতন তরুণ ও যুব শক্তিকে নজরুলের আগুন ঝরা উত্তপ্ত ভাষা মন্ত্রের মত আকর্ষণ করে, ফলে অনেকের কাছে তিনি হয়ে উঠেন 'পহেলা দর্শণধারী' পরে 'গুণবিচারি'। একইসঙ্গে নজরুল সাংবাদিকতার রাজ্যেও নিজস্ব প্রতিভার গুণে কবিতার মত 'এলেন, দেখলেন, জয় করলেন'। সাংবাদিকতার বিশেষ একগুণ সংবাদ সংক্ষেপণ; এই গুণটিকেও নজরুল তাঁর নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে আসেন, 'নজরুলকে বড়ো বড়ো সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা [মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও তাঁর সঙ্গীরা] আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান।'[৭] তাই হয়ত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রথম সংখ্যা, ১২ই জুলাই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশিত হওয়ার পর-পরই বাঙালি পাঠকের মধ্যে অসাধারণভাবে কাগজটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, 'একথা মানতেই হবে যে, নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়েছিল।'[৮] ব্রিটিশ-সরকার দানবীয় শক্তিতে ভারতবর্ষের সম্পদকে সুপরিকল্পিত ভাবে লুণ্ঠন করতে শুরু করে, আর অতি পরিশ্রমের ভারে নত ও অতি অসম্মানিত ব্যাপক ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠীর রক্ত শোষণ করে তারা তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করতে থাকে; ফলে ভারতবাসীর মনে প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশকে বিদেশীর শক্তকবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম-আবেদন সৃষ্টি হয়। নজরুল ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মনের সেই আকাঙ্ক্ষাটি সঠিকভাবে অনুধাবণ করে,

[৬] টীকা: এ. কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬৩) অর্থানুকূল্যে আর মুজফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) ও নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় এ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার আকার রয়াল সাইজ ২০" বাই ২৬"।

[৭] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[৮] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

অর্থাৎ সময়ের দাবী পূরণ করতেই, 'নবযুগ' পত্রিকার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশের যাত্রা। দ্রোহী চেতনা সিক্ত নজরুলের হাতে রচিত হতে থাকে বোধিসত্তা– যা তেত্রিশ কোটি ভারতবর্ষের অধিবাসীর মনপ্রাণের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা; পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমোচন করার অভিলাষ; বিত্তহীন-সর্বহারাকে অন্নহারা, বস্ত্রহারা, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে চিরমুক্ত করার দুর্মর প্রতিজ্ঞা। নজরুল, একদিকে যেমন ভারতবর্ষের অধিবাসীর নিদারুণ দারিদ্র্যতা, দুঃখ ও আত্ম-লাঞ্ছনার জন্য ব্রিটিশ-সরকারকে সীমাহীন শোষণ-লিপ্সাকারী হিশেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের সমস্যা নিজেরা মিটিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এক কথায় তিনি 'নবযুগ'-এর একজন সম্পাদক হিশেবে, যুগোচিত রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে, ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পূর্ণব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এরসঙ্গে কৃষক-মজুরদের দাবীও জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন; ফলে নজরুলের রচনাসমূহ, বিশেষ করে দেশাত্মবোধ প্রবন্ধগুলি, ঔপনিবেশিক সরকারকে যতটা ভাবিয়ে তুলেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি নজরুলের সাম্যবাদী ভাবধারা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ সরকারকে বিচলিত করেছিল। ব্রিটিশ-সরকারকে স্বদেশী গোয়েন্দা, পুলিশ ও আইন কর্মকর্তারা সহযোগিতা করে; এবং তারা গোপন রিপোর্ট তৈরি করে, নজরুলের গতিবিধি এবং তাঁর রচনাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সেগুলিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়; ফলে 'নবযুগ' পত্রিকা রাজরোষে পড়ে এবং এর জামানতের এক-হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন দুই হাজার টাকা জমা দিয়ে আবার পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়; মুজফ্ফর আহ্মদের ভাষায়, 'নবযুগের গরম লেখার জন্য পর পর দুবার কি তিনবার সরকার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। শেষ সতর্ক করেছিল 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের লেখা।'[৯] খিলাফৎ কমিটির একটি ইশতেহার ছাপানোর কারণে যদিও পত্রিকার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় তবু মুজফ্ফর আহ্মদ মনে করেন, 'নজরুলের মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে লেখাটিই বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল।'[১০] তারপর পত্রিকার মত ও পথ নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল ইসলামের মনোমালিন্য শুরু হলে নজরুল 'নবযুগ' পত্রিকা থেকে ইশতেফা দেন, তারপর মুজফ্ফর আহ্মদ যখন 'নবযুগ' ছেড়ে দিলেন তখন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন হিশেবে 'যুগবাণী' গ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে নজরুলের সাহিত্য-সুলভ আবেগ ও দীপ্তির পরিচয় বর্তমান। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে যুক্তি, তর্ক ও বিশ্লেষণ দেওয়া হয় তার শক্তিকাম্যের স্বাক্ষর এইসব রচনায়, অনেক ক্ষেত্রে, অনুপস্থিত থাকলেও ভাবাবেগের দুরন্ত প্রাবল্যে সবগুলি প্রবন্ধই মর্মস্পর্শী, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 'যুগবাণী' সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলেও দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পায় জ্যৈষ্ঠ মাসে। 'যুগবাণী' গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 'নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম 'যুগবাণী', ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করে। সেন্ট্রাল-প্রভিনস ও বর্মা সরকারও যুগপৎ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ করে। বাংলা সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ২৩ নভেম্বর, ১৯২২ সাল এবং ১৬৬৬১ পি।'[১১] 'যুগবাণী' নিষিধ করার পক্ষে পুলিশি গোপন রিপোর্টটি উদ্ধার করেছেন শিশির কর, '[..] 'নবযুগ' বইটি পড়ার সুযোগ না হলেও এ সর্ম্পকে সরকারী ফাইল থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি। তা থেকে বোঝা যায় বইটি রাজরোষে পড়েছিল। এই ধরনের একটি মন্তব্য তুলে দিলাম। I have examined the book 'Yugabani'. It breathes bitter racial hatred directed mainly against the British, preaches revolt against the existing administration in the country and abuses in the very strong language the 'slave-minded' Indians who upholds the administration. The three articles on 'Memorial to Dyer', 'Who was

[৯] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[১০] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[১১] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

responsible for the Muslims massacre?' and 'Shooting the blackmen' are specially objectionable. I don't think it would be advisable to remove the ban on this book in the present crisis. On the whole it is a dangerous book, forceful and vindictive [Sd-illegible, date: 16.1.41, File No. 58-31/40 Home (Pol)].'[12] সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে 'যুগবাণী' কতটা আতঙ্কজনক ও তার প্রকাশে সরকার কতটা বিপদজন হয়ে পড়ে তা প্রমাণ করে এই পুলিশি গোপন রিপোর্টটি। গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হওয়ার ২১-বছর পরও একইরকম ধারণা পোষণ করা এই প্রমাণ করে যে, নজরুলের মনপ্রাণ ছিল বিদ্রোহ ও বিপ্লব কামনায় ব্রত। বিদ্রোহ ও বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করা অসম্ভব– এরকম ধারণা করা তাঁর জীবন-দর্শনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মুক্তি-কামনা করাই ছিল তাঁর আহবান। লক্ষণীয় যে, পুলিশি রিপোর্টে নজরুলের প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ বিরোধী রচনাসমূহ।

নজরুলের 'যুগবাণী' গ্রন্থটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, বিশেষকরে ব্রিটিশ বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলেনের একটি ধারাবাহিকতার সূত্রপাত এতে লক্ষ্য করা যায়। 'যুগবাণী' কেন নিষিদ্ধ হল– এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হয় যে, এর সূচীপত্রটি; সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে এর অন্তর্নিহিত কারণগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হলেও উপলব্ধি করা যায়, 'যুগবাণী'র প্রতিটি রচনাই ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে। মোট ২১টি প্রবন্ধের সংকলন 'যুগবাণী'– (১) নবযুগ; (২) গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ; (৩) ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ; (৪) ধর্ম্মঘট; (৫) লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য; (৬) মুজাহিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?; (৭) বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান; (৮) ছুঁৎমার্গ; (৯) উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন; (১০) মুখবন্ধ; (১১) রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন; (১২) বাঙালির ব্যবসাদারী; (১৩) আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?; (১৪) কালা আদমীকে গুলি মারা; (১৫) শ্যাম রাখি না কুল রাখি; (১৬) লাট-প্রেমিক আলি ইমাম; (১৭) ভাব ও কাজ; (১৮) সত্য শিক্ষা; (১৯) জাতীয় শিক্ষা; (২০) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; এবং (২১) জাগরণী।

'জাগরণী' ব্যতীত সবগুলিই 'নবযুগ'-এর সম্পাদকীয় রচনা; যা ছিল প্রথম প্রকাশিত 'বকুল' (আষাঢ় ১৩২৭)-এর 'উদ্বোধন'-শিরোনামের মৌলিক প্রবন্ধ। 'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলিতে সে-যুগের নব-জাগরণের উল্লাস ও নব-চেতনার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রাণপণ চেষ্টা ছিল তা এখনও উপলব্ধি করা যায়, বিশেষত যখন সত্যিকারের মানব-দরদী কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগিরা একযোগে সাধারণ নিপীড়িত ও শোষিত মানুষকে শোষণ-অত্যাচারে দমিয়ে রাখার কাজে লিপ্ত ছিল, এবং তারা ছিল স্বকীয় স্বার্থসৌধ নিমার্ণে তৎপর, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্যায়, অবিচারের অবসান ঘটাতে হলে সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন, আর তা করা একমাত্র সম্ভব ভারতবর্ষের পূর্ণ-রাজনৈতিক-স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমেই, তবে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্যে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অত্যাবশ্যক; কিন্তু আবেদন বা নিবেদন দিয়ে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়, বরং সংগ্রাম-বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পন্থা; আর এই সংগ্রামের জন্যে প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমাজের নিয়ম-কানুন, বিধান-শাসন-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার তৃষ্ণা মিটাতে, প্রয়োজন অনুযায়ী, প্রথমে ব্রিটিশ-শাসক-শক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য বিদ্রোহ করা আবশ্যক। তাই নজরুল শুরু করেছিলেন 'যুগবাণী'-র মাধ্যমে সেই বিদ্রোহ, শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা করার আহ্বান। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, শোষণমূল রাষ্ট্রনীতির কাঠামোকে ভাঙ্গার জন্য সর্বহারা-বস্তুহারা মানুষগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া অন্যকোনও উপায় নেই। তাঁর তীব্র-বক্তব্য প্রকাশিত হয় 'নবযুগ' প্রবন্ধে, যা ছিল মুক্তিকামী মানুষের এক বিশ্বস্ত দলিল। নজরুল বলেছেন,

> আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা-আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহা-উদ্বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদ-সাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব

[১২] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

> মুক্তিকাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহার শৃঙ্খলমুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো, মুক্তিপাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গার নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে![১৩]

নজরুল তাঁর 'নবযুগ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন 'নবযুগ' পত্রিকার সূচনা সংখ্যার জন্যে, তাঁর এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্পষ্টভাবে নিজের মত, পথ ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। একই প্রবন্ধের আরেকটি বাক্য হচ্ছে এরকম,

> সেই সন্ধানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জল-ভরা চোখে দেখিল, পূর্ব্ব উত্তোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে 'নবযুগ'।[১৪]

'নবযুগ' পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যেখানে সম্পাদকের কাজ, সেখানে নজরুল দেশবাসীর প্রত্যাশাকে একদাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথাই ঘোষণা করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর দেশ-সমাজ-সম্প্রদায়-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে চাননি; তাই তিনি ভারতবর্ষের সকল মানুষকে আহবান করেছিলেন তাঁর লেখনির মাধ্যমে, তাঁর চেতনাপ্রবাহের মৌলিক গতিবেগই হচ্ছে এই; তাঁর কাছে, সকল ধর্মের দেবতারা আজ জাগ্রত, ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনিতে আজ নব সৃষ্টির রোল, তাই ত তিনি লিখেছেন,

> এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান। এস বৌদ্ধ। এস ক্রিশ্চয়ান। [...] ঐ শোনো, নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ত্রাসীর মন্ত্র বাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শোনো, তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য অভিমান নাই।[১৫]

নজরুলের মনে কোনওরকম জাগ্রত ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ছিল না বলেই এমন কথা তিনি লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরজুড়ে ছিল মুক্তিপন্থার সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা, আর এই সন্ধানের একমাত্র পথই ছিল, তাঁর কাছে, জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তি। এই প্রবন্ধে আরও একটি বিষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর নজরুলের সমাজতান্ত্রিক বোধ এবং বিপ্লবী চিন্তার প্রকাশ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ ছাড়া অন্যকোনও উপায় বা পন্থা তাঁর জানা ছিল না। তিনি লিখেছেন,

> আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল 'মারো অত্যাচারিকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারীর শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করে।' 'আল্লাহ আকবরর বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণাশিখা ফেজের রক্ত-রাগ স্বাধীনতা প্রহরীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভুলুদ্ধিত রবাব আবার আ্যালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বের দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ-অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।' এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ– আঁখি মেলিয়া চাহিলেন।[১৬]

---

[১৩] 'নবযুগ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৪] 'নবযুগ, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৫] 'নবযুগ, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৬] 'নবযুগ', কাজী নজরুল ইসলাম।

'নবযুগ' প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনই নয়, বিশ্বের আন্দোলনেরও একটি ছবি ফুটে উঠেছে; কারণ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তর ছিল মুখরিত, তাই মানুষের মুক্তির সনদ সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত থাকা ছাড়া তাঁর কী আর করার থাকতে পারে, তিনি চেয়েছিলেন রাজার শোষণশাসন থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার উপায় সন্ধান করতে; তিনি চেয়েছিলেন দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে, সমাজের অযৌক্তিক বন্ধন ছিন্ন করতে, রাজতন্ত্র-যাজকতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে; তাই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের রচনাগুলিতে তিনি আবেগ ও উচ্ছ্বাসমণ্ডিত কণ্ঠে প্রকাশ করেছিলেন সর্বপ্রকার মুক্তির কথা, ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার কথা; তাই ত তিনি খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে আরও বেগবান, ফলপ্রসূত এবং কার্যকর করে তোলার জন্যে আহবান জানিয়ে 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ'-শিরোনামের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন,

> স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ-মুখো হইয়া কোন অজানা পাষাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ'![১৭]

নজরুল আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেকের প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেছেন,

> বাস্তবিক আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব এরূপ কোন কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ।[১৮]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এই মুক্তির কথা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা স্ফুরিত ভাষার মর্ম বোঝার জন্যে বিশেষ কোনও পণ্ডিতের সাহায্য নিতে হয়নি উৎকণ্ঠিত ব্রিটিশ-সরকারের; কারণ, নজরুলের ভাষা সুস্পষ্ট; এতে প্রকাশ পায় ব্রিটিশের বিবেক ও মনুষ্যত্বের চিত্র; সাধারণ মানুষের ক্রন্দন ব্যথা ও সরকারের প্রতি তাদের ব্যথিত মনের অভিশাপের ছবি। নজরুল তাঁর 'কালা আদমীকে গুলি মারা' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> [...] সব বলিতে গেলে সাদা দাদারা ভয়ানক রকমের চটিতং হইয়া যাইবেন এবং ক্রমাশ্চয়ে আমাদের মুখ বন্ধ, (হাত বন্ধ ত আছেই) পা বন্ধ,– শেষকালে কাঁচা মুণ্ডটাও খক্ত বিখক্ত করিয়া ফেলিবেন। [...] তবে, আমাদের ক্রন্দন ব্যর্থ হইতেছে না। এই যে মানুষের ব্যথিত মনের অভিশাপ ইহা অন্তরে অন্তরে তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে। তোমাদের বিবেককে, মনুষ্যত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই গুলির সমস্ত গুলিই তোমাদেরই হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়া তোমাদিগকে পচাইয়া মারিবে! আমরা জাগিতেছি– আমরা বাঁচিতেছি, তোমরা মরিতেছ, তোমরাই ধ্বংসের পথে চলিয়াছ।[১৯]

সেসময়ের আন্দোলনগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেই নজরুলের সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশিত হয়; আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনগুলি তাঁর চিত্তকে সর্বাধিক আলোড়িত করে, তাই তিনি তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন; যেমন, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাযজ্ঞের নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি যে-ব্যঙ্গ উৎপাত প্রকাশিত হয় 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ'র প্রবন্ধে, এর স্বাদ আজও শিহরিত করে। নজরুল তাঁর 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষ জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জলাদ-কসাই-এর আবির্ভাব মস্তবড় মঙ্গলের কথা। [...] এই ডায়ারের মতো দুর্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মতো করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মতো আমাদের এই

[১৭] 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৮] 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৯] 'কালা আদমীকে গুলি মারা', কাজী নজরুল ইসলাম।

> হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত– না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না।[২০]

এসব কথা থেকে এই প্রকাশ পায় যে, নজরুল ইংরেজ শাসকদের কাছে আবেদন নিবেদন করতে অনিচ্ছুক, বরং তিনি বিদ্রোহের ও তেজের সঙ্গে দাবী করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতা; এই বিষয়টি নিয়ে এত স্পষ্ট ও সোচ্চারভাবে তাঁর আগে কেউ লিখেননি। নজরুলের দৃষ্টিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ার, যার চোখে ভারতবর্ষের মানুষগুলি পশুর চেয়েও অধম এবং এসব অধম মানুষগুলিকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করতে তিনি দ্বিধা করেননি, সেই অত্যাচারীই হচ্ছেন জাতীয় জাগৃতির স্মারক, শক্তির উদ্বোধনের উৎস। তিনি তাঁর 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> মানুষ্যত্বের এ অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুধু ভিক্ষুকের জাতিই হাসিমুখে নিজেদের গৌরব বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য নীচ আর ছোট হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের এত অসাড়-হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই।[২১]

নজরুলের কথায় আরও প্রকাশ পায় যে, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পরাধীন ভারতের বর্ণগোত্র ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে 'জাগাইয়া তুলিতে'। একই প্রসঙ্গে নজরুল তাঁর 'ধর্ম্মঘট' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্কারণরূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ববিহীন ভোগ-বিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ-অভাগাদের বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি।[২২]

নজরুলের উদ্দেশ্য ভারতবাসীর মনে এক বিরাট বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলা, যা গণচেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। ভারতবর্ষের জনগণের অন্তরে যে বিরাট বিক্ষোভ বিদ্যমান তাই প্রকাশ করা তাঁর একমাত্র সাধনা যেন; তাই তিনি তাঁর 'মুজাহিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্ম-সম্মান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই?[২৩]

ভারতবর্ষের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নজরুলের বজ্রকণ্ঠ প্রকাশিত হয়। গুটি-কয়েক ষড়যন্ত্রকারীর দ্বারা ভারতবর্ষের আমজনতা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত; তাই তিনি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অভিরাম লিখে চলেছিলেন। তাঁর লিখনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটিশ-শাসনের বাস্তব চিত্রগুলি। তিনি তাঁর 'মুজাহিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> না জানি আরো কত বাছাদের আমাদের কতো মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। মনে রাখিও সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে। দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে![২৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের খেলাফৎ উচ্ছেদের চক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত হলে নিখিল ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, শুরু হয় ভারতবর্ষের আন্দোলন, ব্রিটিশ-শক্তি ও তার সাম্রাজ্যবাদী চেহারা উন্মোচনে

---

[২০] 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২১] 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২২] 'ধর্ম্মঘট', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৩] 'মুজাহিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৪] 'মুজাহিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুলের উৎসাহ প্রকাশিত হয় সর্বাধিক, তিনি মুসলমানদের আন্দোলকে কেন্দ্র করে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ বিশ্বের সামনে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকেন, যা তার খেলাফৎ সমর্থনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> যিনি যে দেশেরই হউন, সকলের অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এই সব সুক্ষ্ম দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।[২৫]

সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, এই সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপেই প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়াজাত স্বদেশী আন্দোলন এবং এ-দেশের সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা রাজনীতির চোরাগলিতে প্রবেশ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুলের প্রতিবাদী কণ্ঠ প্রকাশ পায়, 'হিন্দু-মুসলমান-মাড়োয়ারী, বাঙালি-হিন্দুস্থানীর কোনও ভেদাভেদ ছিল না, কোন জাতবিচার ছিল না।'[২৬] নজরুল ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উচ্চকণ্ঠা প্রবক্তা ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর বাণী ছিল উদ্বেলিত আগুনে গলা লৌহার মত উদ্ভাসিত; কারণ, তাঁর সাম্যরাজ্যে সব মানুষ সমান, তাদের মাঝে বৈষম্য নেই, নেই কোনও ধর্মীয় ব্যবধান বা বর্ণের বিভেদ; ফলে তাঁর সাধনার আরেকটি মন্ত্র ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার। তিনি তাঁর 'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধে বলিষ্ঠ-বজ্রকণ্ঠে আহবান জানিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

> মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ– তুমি সত্য। [...] মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা- মনুষ্যত্বের ও আত্মর অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা।[২৭]

স্পষ্টই বোঝা যায় একজন হৃদয়াবেগ সম্পন্ন মানুষ তাঁর জীবনে তীব্রভাবে ভালো ও মন্দের স্বাদগ্রহণ করে নীলকণ্ঠের মত তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন শত্রুর আঘাত, রাজরোষের কষাঘাত, পীড়ন ও অকাল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। তিনি ভারতবাসীদের আত্মার অবমাননা নিয়ে তাঁর 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> আমরা ভারতবাসীরাই শুধু আত্মার এত অবমাননা করিতে সাহস করি, আর তাই আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতন, তাই বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আমাদের স্থান নাই।[২৮]

নজরুল দুঃশাসনের বিরুদ্ধে টগবগিয়ে উঠেছিলেন, আর অত্যাচারী শাসকের প্রাসাদশীর্ষ চূর্ণ করে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে তাঁর 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> জোর-জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জনসঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে, এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ও রকম ছেলে-মানুষী চলিবে মনে কর?[২৯]

অন্যায় অবিচার আর পরাধীনতা কোনও মানবধর্ম হতে পারে না, তাই তিনি বিনাশরূপী ধূমকেতুর শিখা হিশেবে নিজেকে প্রতীকিত করে তাঁর 'রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন' প্রবন্ধে লিখেছেন,

---

[২৫] 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৬] 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৭] 'ছুঁৎমার্গ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৮] 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', কাজী নজরুল ইসলাম।
[২৯] 'মুখবন্ধ', কাজী নজরুল ইসলাম।

> ধূমকেতু ইহার পুচ্ছে নিশ্চয়ই গ্যাস ভরিয়া রাখে। এই গ্যাস অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর বাতাস হইতে যবক্ষারজান শুষিয়া লইতে পারে; এবং তাহা হইলে যেদিকে যাও সেই দিকেই মরণ আর কি।[৩০]

নজরুল রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা সার্থক করার প্রশ্নে বাঙালির ব্যবসাদারী সম্বন্ধে কতগুলি দোষগুণ তুলে ধরে, সেগুলিকে সংশোধন আবশ্যক বলে মনে করে, বাঙালিকে মানুষ করে তোলার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। আমাদের যে কী অবস্থা তাকে বিচার করার জন্য, আমাদের ব্যবসার সন্ধান নিতে ও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যর সঙ্গে আমাদের সমাজের কী সম্বন্ধ তাতে আমাদের কতটা উপকার বা কতটা অপকার সাধিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় আমাদের কী সম্বন্ধ থাকা উচিত, কীরূপে তার মীমাংসা করা প্রয়োজন– এসব প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়; তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে আর কতটা সাধারণ মানুষের হাতে থাকা উচিত– এসব প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করে হবে; সবই বাতিয়ে দিয়েছিলেন নজরুল। নজরুল চিন্তা করেছিলেন কী করে এই নব-জাগ্রত বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত করে তোলা যায়; এবং বাঙালির বিকাশের জন্য কী কী করা আবশ্যক তাও বলে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'বাঙালির ব্যবসাদারী' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজো যদি আমাদের আত্ম-সম্মান না জাগে– আজো যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভয় করিয়া নিজের মনুষ্যত্বের ও পুরুষ্কারের জোরে মাথা উঁচু করিয়া বিশ্বের মুক্ত-পথে চলিতে না পারি, তবে আমাদের জাতি-গঠন তো দূরের কথা, মুক্ত-দেশের অন্যে এ-কথা শুনিলে মাথায় টোক্কর লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো।[৩১]

বাঙালির সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধানার সঙ্গে তাদের স্বাধীনতার কী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, তার বিচার করা অবশ্যই কর্তব্য, সেদিকে চোখ না রাখলে সবদিকই যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তা নজরুল জানতেন, 'যতক্ষণ না আমরা বাহিরে স্বাধীন হইব, ততক্ষণ অন্তরের স্বাধীন-শক্তি আসিতেই পারে না।'[৩২] এক শ্রেণীর গণবিরোধী ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা নতুন পথ খুঁজছিলেন, তা নজরুলের কাছে অজ্ঞাত ছিল না, বরং তিনি তাদের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। চরিত্রহীন নেতারা স্বার্থপর, মদখোর, চোরাকারাবারী, ঘুষখোর ও আত্মগরিমায় মত্ত, এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতবর্ষের কল্যাণ কখনওই আসতে পারে না, এদের দ্বারা জনসাধারণের মুক্তি কখনই হতে পারে না। ভারতবর্ষের এসব ক্ষমতালোভী নেতাদের স্বরূপ ফুটে ওঠে তাঁর 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এবং 'লাট প্রেমিক আলি ইমাম' এই দুটি প্রবন্ধে। নজরুল তাঁর 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' প্রবন্ধে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকারকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,

> লর্ড সিংহ বাহাদুর বড় অসময়ে লাট ও শাসনকর্তা হইয়াছেন। এখন তিনি দেশের লোকের মন যোগাইয়া চলিতে পারেন না, আবার তাহার অধীন বিলিতি শাসনকর্তাদিগকেও জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন না, পাছে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া বসেন! দেশের লোক এখন যাহা চায়, তাও যদি আবার তিনি বিনা বাধায় চলিতে দেন, তাহা হইলে তো আবার তাহাকে একদিনেই পাততাড়ি গুটাইতে হয়। [...] যতক্ষণ দেশের আদত শাসনকর্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক, যতক্ষণ দেশ পরাধীন থাকে, ততক্ষণ দেশীয় ছোটখাট শাসনকর্তারা কিছুতেই লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।[৩৩]

---

[৩০] 'রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন', কাজী নজরুল ইসলাম।

[৩১] 'বাঙালির ব্যবসাদারী', কাজী নজরুল ইসলাম।

[৩২] 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?', কাজী নজরুল ইসলাম।

[৩৩] 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', কাজী নজরুল ইসলাম।

'লাট প্রেমিক আলি ইমাম'ও অনুরূপ রচনা। হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার আলি ইমাম লাট। তিনি ব্রিটিশ-ভারতের নবনিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিডিংয়ের সম্মানার্থে ভোজসভায় তাকে খুশি করার উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁর মনে অবশ্যই ছিল গভর্ণর হওয়ার ইচ্ছা; কিন্তু লর্ড রিডিং তাঁর প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন তা স্যার আলি ইমামের জন্যে প্রীতিকর ছিল না। এই ঘটনার উল্লেখে নজরুল লিখেছিলেন 'লাট প্রেমিক আলি ইমাম' প্রবন্ধটি। তিনি লিখেছেন,

> রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ-সুবিধাটাই তাহাদের লক্ষ্য– বাকী সব চুলোয় যাক তাহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই! [...] সার আলি ইমাম এখন লাট হইবার আশায় কত রকম ঢলানই ঢলাইবেন এবং কর্তাদের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকমেই না পুচ্ছ নাড়িয়া নিজের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি জানাইবেন [...] সার আলি ইমামকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের গায়ের দাগগুলো কি এমন করিয়া মাখন ডলিলেই এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে?[৩৪]

'নবযুগ' প্রত্রিকায় ও 'যুগবাণী' গ্রন্থে প্রকাশিত নজরুলের শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলি হচ্ছে 'ভাব ও কাজ', 'সত্য শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা' ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সরকার এমন একটা ভাব পোষণ করে যে, মনে হয় শিক্ষার ক্যারিকুলামের পুরোটাই ভারতের ইতিহাস, যা ঐতিহ্য আর সভ্যতার আলোকে তৈরি; কিন্তু সেটা যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নয় তা নজরুলের 'জাতীয়-শিক্ষা' প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে,

> এখন যে-পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ঠিক ঐ রকম বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া 'স্বদেশী' মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত। [...] যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় বিদ্যালয় বলিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না।[৩৫]

'জাতীয় শিক্ষা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে জাতীয় বিদ্যালয়। এই প্রবন্ধে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় যে-শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে-শিক্ষা ভারতবর্ষবাসী, বিশেষ করে তরুণ-সমাজ, সহজেই আয়ত্ত করতে পারে সেই শিক্ষাই ভারতবাসীকে দেওয়া উচিত বলে নজরুল মনে করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা বা নিম্নশিক্ষাই হোক, অন্যকোনও শিক্ষাদীক্ষার আদর্শই হোক– সবরকমের শিক্ষাই ভারতবর্ষীয় জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত; এ নজরুল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন ধার করা শিক্ষার অহঙ্কার থেকে ভারতবর্ষের মানুষকে মুক্তি পেতে হলে প্রকৃত শিক্ষার চর্চায় তাদের নিযুক্ত করা আবশ্যক। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে অন্তরমুখীন করা প্রয়োজন, আর ভারতবর্ষীয়দের স্বভাবধর্মের পূর্ণ-বিকাশের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেই শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করে তোলা দরকার, এসব মনে রেখেই তিনি তাঁর 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন,

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।[৩৬]

'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধের বিষয়ও জাতীয় বিদ্যালয়। এই প্রবন্ধে নজরুল সংশয় প্রকাশ করেছিলেন অযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ, পাঠক্রম ও শিক্ষামান সম্পর্কে। আর 'সত্য শিক্ষা' প্রবন্ধে নজরুল প্রকাশ করেছেন, ইংরেজি

[৩৪] 'লাট-প্রেমিক আলি ইমাম', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৩৫] 'জাতীয় শিক্ষা', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৩৬] 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', কাজী নজরুল ইসলাম।

শিক্ষায় ভারতবাসীকে খুব পণ্ডিত করে তোলার প্রয়োজন নেই, বরং নব-জাগৃতিক জাতিকে প্রকৃতজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, নিজের ভাষা শিক্ষা করা, নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা, নিজের শিক্ষাদীক্ষার যে-সরল সত্যবাণী আছে সেদিকে দৃষ্টি রাখা; আর এসব করতে পারলেই ভারতবাসী প্রকৃতজ্ঞান লাভ করে উচ্চস্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে। তিনি তাঁর 'সত্য শিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মুঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিকে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে না, [...] তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য– দেশে ভাইয়ের কাছ হইতে তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্ম্মীর ত্যাগ ও কর্ম্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া, [...] আমরা দেখিতে চাই কোন্ নেতার চেষ্টায় কোন্ দেশসেবকের ত্যাগে কতটী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিক্ষা হইল। আমরা দেখিতে চাই, আমাদের কতগুলি তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। আমরা দেশ-সেবক চিনিব ত্যাগে, বক্তৃতায় নয়।[৩৭]

ভারতবর্ষের এই নবজাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে তার উন্নতিসাধন করতে হলে, তাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করে ও সাক্ষী রেখে তৎকালীন অবস্থা আলোচনা করে, কী কী উপায় অবলম্বন করলে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধন করা যাবে, তা নির্ধারণ করে নজরুল তাঁর 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে।[৩৮]

আলোচ্য প্রবন্ধে আন্দোলনের ডাকে সরকারী বিদ্যালয় বর্জনের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। আর নজরুল তাঁর স্বদেশবাসীকে তাঁর প্রাণের নিবেদন এবং বাঙালির যৌবনশক্তির জাগরণের কথা প্রকাশ করতে লিখেছিলেন 'জাগরণী' প্রবন্ধটি। 'জাগরণী' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> জাগো– জাগো, পল্লীবুকের বেদন নিয়ে, পল্লীশিশুর ঝর্ণাহাসি নিয়ে, আর তরুণদের সবুজ বুকের অরুণ খুনের উষ্ণগতি নিয়ে![৩৯]

'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী এবং অন্যান্য কবিতার অনেক আগেই এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে নজরুলের প্রতিবাদ, ব্যঙ্গ, উপযুক্ত ধারণার প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ শাসকশোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। শাসকশোষকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর আচরণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে চলে নজরুলের এই প্রবন্ধাবলী।

প্রসঙ্গত তাই আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'যুগবাণী' গ্রন্থে পুরাণের ব্যবহার। নজরুল সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন, তাই তিনি তাঁর প্রবন্ধেও তাঁর কবিতার মত উপমা-সংরাগ, রূপক-উৎপ্রেক্ষার বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন; ফলে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে ভারতবর্ষীয় পুরাণের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নজরুল তাঁর প্রবন্ধে পুরাণ-প্রতীক ব্যবহারের পাশাপাশি ধর্মীয় চেতনা থেকেও পৌরাণিকীর ব্যবহার করেছিলেন, মূল কারণ: পুরাণ প্রতীকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। তিনি তাঁর 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ' প্রবন্ধে মুসলিম বিশ্বাস-ঐতিহ্যের প্রয়োগ এবং রুদ্র ভীষণতার উপমা হিশেবে 'চণ্ডী' দেবীর উল্লেখ করেছেন। এই দুটি পুরাণ প্রয়োগের প্রতীকি মর্মার্থ এই যে, নিদ্রিত কিংবা ক্লিবত্বপ্রাপ্ত

[৩৭] 'সত্য শিক্ষা', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৩৮] 'ভাব ও কাজ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৩৯] 'জাগরণী', কাজী নজরুল ইসলাম।

পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষকে স্বাধীনতা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা, 'বেদনাতুরের প্রার্থনায় 'আলর আরশ' টলিয়া যায় ।[...] যদি এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে রণচণ্ডীর মারামারির মধ্যে, আমাদের মনুষত্ব জাগে ।'[৪০] 'ছুৎমার্গ'-এ কালাপাহাড় আর 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য'-এ জন্মভূমির বীরবাহু ব্যবহার করেছেন । এছাড়া কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও প্রবাদসম কবিতা, গানের পঙক্তি উদ্ধৃত হয় । কালাপাহাড় ধ্বংসের প্রতিরূপক হিশেবে বর্ণিত হয়েছে, আর রাবণপুত্র বীরবাহু রামচন্দ্রের হাতে নিহত হওয়ার পর যেভাবে শোকাতুর হয়ে পড়ে লঙ্কাবাসী, তারই প্রতিরূপক হিশেবে নজরুল ব্যবহার করেছেন লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে কলকাতাবাসীদের বেদনাতুর বিলাপের কথা; এখানে তিনি তিলককে দেশপ্রেমিক রাবণের পুত্র বীরবাহুর সঙ্গে তুলনা করেছেন; যিনি অকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জীবন বলি দিয়েছিলেন । এখানে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে শোকাবিহবল নজরুলের অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শনই প্রকাশ পায় । তিলক ছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দু নেতা, যিনি হিন্দুমেলা ও শিবাজী উৎসবের মত হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবর্তন করেছিলেন; কিন্তু তিলকের বড়গুণ ছিল তিনি ব্রিটিশ-শাসনের অবসান চেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে হিন্দুশক্তির উদ্বোধনও; তবে নজরুল ভারতমাতার স্বাধীনতাকামীদের বিভক্ত করে আত্মশক্তি ক্ষয় করতে চাননি । 'লাট প্রেমিক আলি ইমাম' এবং 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়'-এ দুটি প্রবন্ধে 'বুদ্ধদেব' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে । 'লাট প্রেমিক আলি ইমাম'-এ 'আমি বুদ্ধদেব নই', অর্থাৎ বোধিসত্ত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব নন, একই কথা লিখেছেন নজরুল ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং-এর জবানীতে; আর 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে ব্যঙ্গ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে লিখেছেন, 'একেবারে বুদ্ধদেব'; অর্থাৎ অহিংসবাদী গৌতম বুদ্ধ যেন ইংরেজ সরকার! পৌরাণিক ব্যবহারের আরও উদাহরণ হচ্ছে:

১. আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন । নরের মাঝে আজ তাহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ;
২. ঔ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গার নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল;
৩. ঐ যে ভীম রণকোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে;
৪. সাগ্নিক ঋক্ মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নিপাথারের অগ্নিকল্লোলে;
৫. নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই । আজ নারায়ণ মানব;
৬. তখন কসাই-এর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচলাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল;
৭. আল্লাহু আকবার বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল;
৮. এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ– আঁখি মেলিয়া চাইলেন ।

'ঔ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গার নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল': এই উদ্ধৃতিতে ভারতবর্ষীয় পুরাণ প্রয়োগের পাশে যুক্ত হয়েছে ইসলামিক চেতনা ও বিশ্বাস । আল্লাহর ফেরেশতা ইসরাফিল যিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার জন্যে । সেই মহাশিঙ্গা, মহাপ্রলয় । মুসলমানরা মহাপ্রলয় বা কেয়ামতে বিশ্বাসী । হযরত ইসরাফিল আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফু দিলেই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু নজরুল এই মহাপ্রলয় শিঙ্গার ধ্বনিকে 'নব সৃষ্টি'র উল্লাস 'ঘন রোল' বলে চিহ্নিত করেছেন; মানবতাবাদী চেতনায় তাঁর বিশ্বাস– আল্লাহর কল্যাণকামিতার ধ্বংস অনিবার্য সত্য নয় বরং চির সৌন্দর্যের নবরূপায়ণই ওই শিঙ্গার কাজ ।

'আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন । নরের মাঝে আজ তাহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ': নজরুল তাঁর প্রবন্ধে হিন্দুদের তিন মহাশক্তি– ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব-এর স্থান করে দিয়েছেন । এই ত্রিমূর্তির এক রূপ– নারায়ণ, তিনি সৃষ্টির পালক । মানবতার জন্যে, মানব ধর্মের জন্যে, মানবধর্ম রক্ষার জন্যে তিনি নানা অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তাঁর আরেক রূপ কৃষ্ণ, যিনি ক্ষীরোদসাগরের অনন্ত শয্যায় আজও নিদ্রিত; তাই তিনি বলেছেন, 'আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন ।'

[৪০] 'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষ হ', কাজী নজরুল ইসলাম ।

'নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব': এতে নরে অর্থাৎ মানবে আর নারায়ণে কোনও ভেদ নেই; তবে মানুষ দেবতাতে রূপান্তরিত হয় না, নজরুল ভগবানকে 'মানব'-বলে চিত্রিত করেছেন শুধু– কেননা, মানুষ নারায়ণের স্বয়ম্ভু এবং মানুষ আজ মুক্তস্বাধীন হতে চায়। প্রসঙ্গত, নজরুল নারায়ণকে ও আল্লাহকে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাটাতন হিশেবে ব্যবহার করেছেন; পূরাণ হিশেবে নয়। নজরুলের এই দ্বিমাত্রিক ব্যবহার অসাম্প্রদায়িক চেতনাভিসার বলেই চিহ্নিত হয়। মানবপ্রেমিক নজরুল সকল ধর্মের ঈশ্বরকেই মানুষের, শাশ্বতর এবং মুক্তিশান্তির উৎসস্থল হিশেবে বিবেচনা করেছেন, এজন্যে তাঁর মানস পরিক্রমণ স্বতঃস্পূর্ত, আর এই কারণেই তাঁর প্রবন্ধগুলি কাব্যময়, প্রতীকিত ও প্রাণের আবেগে ভরপুর।

প্রাবন্ধিক নজরুলের গদ্যশৈলী বিচারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দোষ হিশেবে চিহ্নিত করা হয় যে, তাঁর পুরাণ প্রয়োগের অতি-ব্যবহারের ব্যাপারটিকে। 'যুগবাণী'তে পুরাণের অতি প্রয়োগ লক্ষ্যগোচর হয় না, হয়ত অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধেও এ-মন্তব্য বা চিহ্নদান করা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। নজরুলের চেতনাপ্রবাহে, পরিণতিতে, আধ্যাত্মিকবাদীতার ধ্যান-ধারণায় আত্মবিস্মৃতির রেণু-পরমাণু ছড়ালেও দ্রোহের উল্লাস লুপ্ত হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ মারমুখী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, যা হয় তাঁর বাক-হারানোর অনেক আগেই। মনে রাখতে হবে যে, নজরুল একজন বিপ্লবী লেখক; একজন মানববাদী চেতনাসিক্ত সাম্যবাদী লেখক; একজন রাজ-আইন অমান্যকারী দ্রোহী লেখক; একজন সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার লেখক; একজন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী লেখক; একজন শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণা জাগানোর লেখক।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'যুগবাণী' নজরুলের স্বকালকে ধারণ করেছে, এজন্যে এর ঐতিহাসিক মূল্য যেমন আছে, তেমনি আছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও জনগণমন-জাগরণের নান্দনিক নির্মাণ কৌশলও। ড. সৈয়দ আকরাম হোসেন লিখেছেন, 'নজরুল মানস-প্রবাহে বহুমূখী স্রোতের যোগাযোগ স্বতঃই স্বাভাবিক। বিদ্রোহ, প্রশান্তি, বাস্তববোধ, আধ্যাত্মিক রোমান্টিক প্রবণতা, স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যাশা, নৈরাজ্যিক অস্থিরতা, সাম্যবাদী চিন্তা, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস প্রভৃতির যোগফল নজরুল চেতনা-প্রবাহ।' নজরুলের 'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলি তথ্য ও শিল্পগত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত, তা হল– স্বাধীনতা ও সত্যের পক্ষে তাঁর অকুতোভয় অবস্থান। 'যুগবাণী'র প্রবন্ধে এসব পরিলক্ষিত; যেহেতু নজরুল– আত্ম-রাজনীতিক না হয়েও রাজনৈতিক অভিঘাতে আলোড়িত, নিজের চেতনালোক দ্বারা পরিচালিত, তাই ত তিনি তাঁর আবেগাক্রান্ত দ্রোহের ফসল হিশেবে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরাণিত করার হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন স্বীয় সৃষ্টিশীল রচনাসমূহ, তবে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উৎসভূমি ছিল মানবপ্রেম, প্রকাশের মাধ্যম বিদ্রোহ ঘোষণা করা– পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কাম্যই সেই বিদ্রোহের অন্বিষ্ট। নজরুল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যখন এই রচনাগুলি সম্পাদন করেন তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ-শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অনেকেই বিশেষকরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একটি সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ-শাসনকে আশীর্বাদ হিশেবেই বিবেচনা করেছিলেন। যদিও নজরুলের আগেই কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে দেশ-প্রেমমূলক কিছু রচনার নমুনা দেখা যায়, কিন্তু তা ছিল খণ্ডিত, যত না ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশি অতীতের মুসলিম বিজয়ের বিরুদ্ধে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বাধীনতাহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও তাঁরা দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এমনকী ব্রিটিশ শাসনের অপকারিতা সম্বন্ধেও লেখকদের সুষ্ঠু ধারণা ছিল না। অনেকেই মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন তাঁদের জন্য একটি আশীর্বাদ। আধুনিক ইংরেজ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এমনকি বঙ্কিমের মধ্যেও স্বাধীনতা ও দেশ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, কিন্তু তিনি দেশের কল্পিত শত্রু হিশেবে হীনবল এবং অবাচ্চব মুসলিম শাসনকে চিহ্নিত করে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। নজরুলই প্রথম এসব দ্বিধা অতিক্রম করে স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, আর তাঁর সর্বপ্লাবী লেখনির কারণে লেখকদের মত রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও তাদের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন, ফলে শীঘ্র পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য সর্বব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই আন্দোলন দীর্ঘসময় ধরে একটি শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছিল। ব্রিটিশ থাকা এবং ব্রিটিশ যাওয়ার মধ্যে লাভক্ষতির হিশেব একটু বেশি মাত্রায় কাজ করেছিল, এসব

দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে নজরুল প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নজরুলও এমন একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যাদের হারানোর কিছুই ছিল না, ফলে যা তাঁকে সর্বজনীন মুখপাত্রে পরিণত করেছিল।

নজরুল ব্রিটিশ শৃঙ্খলিত শাসনকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার ওপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বঞ্চিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।'[৪১] কিন্তু নজরুলের এই চেতনালব্ধ অস্প্রাদায়িকতা অনুসরণ করেননি পরাধীন ভারতের রাজনীতি এবং রাজনৈতিকরা। পরিনামে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আর এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, গোটা ভারতবর্ষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক বিভক্তির জন্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দায়ী যদিও করা যায়, তবুও বলতে হয় যে, কংগ্রেসী জওহরলাল নেহেরুও এরজন্যে কম দায়ী নন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিশেবে জওহরলাল নেহেরুর একটি সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তান এই দু-রাষ্ট্রের জন্মের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্বের ইতি টানা গেলেও আজ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক প্রীতি, সাম্য ও সহাবস্থান রচিত হয়নি। কেননা দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় মানবতার চেয়ে নিজ ধর্মকেই তরবারি হিশেবে ব্যবহার করে আসছে। নজরুলের কবিসত্ত্বকে যত বড় করেই জানা হয় না কেন, তাঁর সাংবাদিকসত্ত্বকে ঠিক ততখানি মনে রাখা হয় না; কিন্তু তাঁর কবিতা যেমনি এখনও বাঙালিকে আনন্দ দান ও উদ্বোধনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে দেয় না, তেমনি তাঁর সাংবাদিক-কর্মও বাঙালির কাছে অনুপ্রেরণার অনুসঙ্গ হয়ে থাকবে, বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে। নজরুলের দেশ ও তাঁর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দলিল হিশেবে তাঁর এই গ্রন্থটি সবার কাছে চিরাম্লানবাণী হয়েই থাকবে।

[৪১] নজরুল রচনা-সম্ভার, কলিকাতা, ১৩৭৭।

দুর্দিনের যাত্রী ও রুদ্রমঙ্গল

'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় 'দুর্দিনের যাত্রী'[৪২] ও 'রুদ্রমঙ্গল'[৪৩] গ্রন্থদ্বয়। দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)-র প্রবন্ধগুলি হচ্ছে: 'আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল', 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক', 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', 'স্বাগত', 'ম্যয় ভুখা হুঁ', 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' ও 'আমি সৈনিক'। আর 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটির নিবন্ধগুলি হচ্ছে: 'আমার পথ', 'মোহররম্', 'বিষ-বাণী', 'ক্ষুদিরামের মা', 'ধূমকেতুর পথ', 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান'। প্রসঙ্গত, 'ধূমকেতু'র কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় নজরুলের 'অগ্নি-বীণা'[৪৪], 'বিষের বাঁশী'[৪৫] ও 'ভাঙার গান'[৪৬] প্রভৃতি গ্রন্থে। 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' সম্বন্ধে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'নজরুলের দু'খানা কবিতার বই– "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান"– বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা বাজেয়াফ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সব ছাপানো পুস্তক তো এক সঙ্গে বাঁধানো হয় না, অন্তত আগেকার দিনে হতো না। ছাপানো ফর্মাগুলি কোনো দফ্তরীর গুদামে ক'টন কাগজের তলায় চাপা পড়ে থাকত তা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ছাপানো ফর্মাগুলি এইভাবে থেকে যাওয়ায় নজরুলের অনেক উপকার হয়েছিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে আমি যে গিরেফ্তার হয়েছিলাম তার পরে বর্তমান উত্তর প্রদেশের নানা জেল ঘু'রে ও স্বাস্থ্যের কারণে ক'মাস আলমোড়ায় বাস করার পরে আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২রা তারিখে। এসে জানতে পেলাম যে নজরুলের নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানা সংগ্রহের জন্য অনেকের, বিশেষ করে যুবকদের, আগ্রহের অন্ত নেই। আমি কত যুবককে এই পুস্তক দু'খানার জন্য আবদুল হালীমের নিকট আসতে দেখেছি। নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য মানুষের একটা অদ্ভূত আকর্ষণ হয়। আব্দুল হালীম জানত কোন্ দফতরীর নিকটে নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানার ফর্মাগুলি আছে। আরও অনেক যুবক নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের ব্যাপারে নজরুলকে সাহায্য করেছেন। চুঁচুড়ায় প্রাণতোষ চট্টপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। দুর্দিনে এই পুস্তক দু'খানা নজরুলের পরিবারের অনেক সাহায্য হয়েছে।'[৪৭]

'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটিও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। গবেষক শিশির কর'র তথ্যানুযায়ী পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারী আইন বিশারদবৃন্দ 'রুদ্রমঙ্গল'কে নিষিদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দেয়। ৫ই আগস্ট ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক প্রসিকিউটর টি. এন. সাধু লিখেছেন, 'I do not advise the prosecution of the author of this book under Sec. 124A I.P.C., but I do advise the forfeiture of the book under Sec. 99A (1) of the criminal procedure code.'[48] ১৭ই আগস্ট ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি কমিশনার ফেরারওয়েদার 'রুদ্রমঙ্গল'কে বাজেয়াপ্ত করার জন্য চীফ সেক্রেটারিকে সুপারিশ করেন, 'In the circumstances I request that government may be pleased to proscribe the book as early as possible!'[49] তারপর সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে, এই বইয়ের জন্য নজরুলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, 'I think we should ask D.C.S.B. to warn the author not to publish any more

[৪২] টীকা: প্রথম প্রকাশ– আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (অক্টোবর ১৯২৬)।

[৪৩] টীকা: প্রথম প্রকাশ– ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশক– নজরুল, ঠিকানা– বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক– ভট্টাচার্য প্রিটিং ওয়ার্কসের শ্রী অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য।

[৪৪] টীকা: গ্রন্থ– কবিতা, প্রথম প্রকাশ– কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (২৫শে অক্টোবর ১৯২২), উৎসর্গ– ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।

[৪৫] টীকা: গ্রন্থ– কবিতা ও গান, প্রথম প্রকাশ– শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (১০ই আগস্ট ১৯২৪), উৎসর্গ– বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে, বাজেয়াপ্ত– ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার– ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।

[৪৬] টীকা: গ্রন্থ– কবিতা ও গান, প্রথম প্রকাশ– শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (আগস্ট ১৯২৪), উৎসর্গ– মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে, বাজেয়াপ্ত– ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ– ১৯৪৯।

[৪৭] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[৪৮] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

[৪৯] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

copies, if he ignores to warning, we can then proscribe./ SD. (Illegible) / 18.9.1927.'[50] বাংলা আইনসভার কার্যবিবরণী থেকে আরও দেখা যায় যে, 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ না দিয়েই সংশিষ্ট নথিটি (ফাইল নং ১৩, স্পেশাল ১-৩) বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫১] 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটি 'সরকারী বিষ নজরে পড়লেও বাজেয়াপ্ত হয়নি।'[৫২] এই গ্রন্থটি নজরুল নিজেই প্রকাশ করেছিলেন; কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানিয়ে এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

> নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মা'কে আমার উলঙ্গ ক'রে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাবকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চ'লেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায় ক্রন্দন, 'বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে–' শুধু ক্রন্দন, শুধু-হা-হুতাশ– শক্তি নাই, সাহস নাই। [...] এ কি বেদনা! এ কি ক্রন্দন! উৎপীড়িতের আর্তনাদে, "মজলুমের ফরিয়াদে" আকাশের সারা গায় আজ জ্বালা, বাতাসের নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে ব্যথা, মাতা বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মাধূম। অত্যাচারীর ভীম নিষ্পেষণে বাসুকীর অচল ফণা থরথর ক'রে কাঁপছে, এই ভূমিকম্পের কম্পিতা ধরণীকে অভয়-তরবারি এনে সান্ত্বনা দেবে, কে আছ বীর? আন তোমার প্রলয়-সুন্দর করাল কমনীয় হস্ত। [...] জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা![৫৩]

'দুর্দিনের যাত্রী' ও 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থ দুটির প্রবন্ধনিবন্ধ নিয়ে আলোকপাত করতে হলে 'ধূমকেতু' নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। 'নবযুগ' পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নজরুল দেওঘরে চলে যান। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁর দৈনিক 'সেবক'-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি পত্র নজরুলের কাছে পৌঁছলে তিনি কলকাতায় এসে কিছুদিনের জন্য 'সেবক'-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন।[৫৪] তারপর, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল আজীজ আল-আমান বলেছেন যে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) মৃত্যু উপলক্ষে রচিত নজরুলের সম্পাদকীয় নিবন্ধ পরিবর্তিত হয়ে 'সেবক'-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ডাকযোগে তাঁর পদত্যাগপত্রটি পাঠিয়ে দেন।[৫৫] প্রসঙ্গত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু নজরুলকে খুবই বিচলিত করেছিল তাই তিনি তাঁর গভীর অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা মিশিয়ে এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন।[৫৬]

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক-বিদ্রোহ চেতনার সার্থক রূপকার, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সর্বাধিক বিখ্যাত, আলোচিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি প্রকাশ করে। নজরুলের অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ই আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এ-ছিল ৮-পৃষ্ঠার ক্রাউন ফোলিও সাইজের ১৫" বাই ১০"। দাম ছিল প্রতিসংখ্যায় এক-আনা, বার্ষিক পাঁচ-টাকা। প্রচারসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। 'ধূমকেতু'র সারথি (সম্পাদক) হিশেবে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম; তিনি এর একবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন। নজরুলের কারাবরণের জন্যে দ্বাবিংশ সংখ্যায় সারথি হিশেবে আসেন অমরেশ কাঞ্জিলাল, যা প্রকাশ পায় ২৭ জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। কর্মসচিব ছিলেন শ্রী শান্তিপদ সিংহ। আফজাল উল হক ছিলেন মুদ্রাকর ও প্রকাশক

[৫০] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।
[৫১] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।
[৫২] নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।
[৫৩] ভূমিকা, রুদ্রমঙ্গল, কাজী নজরুল ইসলাম।
[৫৪] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।
[৫৫] নজরুল রচনা-সম্ভার, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৭।
[৫৬] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

(১১ই জুলাই ১৯২২–২৫শে অক্টোবর ১৯২২)। 'ধূমকেতু'র ৮ম সংখ্যা থেকে প্রেস ও পাবলিসিং অফিস ছিল ৭ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লেন, মেটকাফ প্রেস, ৩২ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা; এর আগের সংখ্যাগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল মেটকাস প্রেসে, ৩নং কলেজ স্কোয়ার থেকে। নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ৩২টি সংখ্যা (২৭শে জানুয়ারী ১৩২৯) প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'ধূমকেতু'র মোট ৩২টি সংখ্যার মধ্যে পাঁচটি ছিল বিশেষ সংখ্যা: 'মোহর্‌রম সংখ্যা' (৭ম সংখ্যা, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২২), 'আগমনী সংখ্যা' (১২শ সংখ্যা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২), 'দিপালী সংখ্যা' (১৫শ সংখ্যা, ২০ই অক্টোবর ১৯২২), 'কংগ্রেস সংখ্যা' (৩০শ সংখ্যা, ১০ই ডিসেম্বর ১৯২২), এবং 'নজরুল সংখ্যা' (৩২শ সংখ্যা, ২৭শে জানুয়ারী ১৯২৩)। আর 'ধূমকেতু'র নিয়মিত ও অনিয়মিত বিভাগগুলি ছিল: 'দেশের খবর' (দেশের সংবাদ); 'মুসলিম জাহান' (মুসলিম বিশ্বের সংবাদ); 'পরদেশী পঞ্জী' (মূলত ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ); 'অগ্নি সম্মার্জনী' (দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ঘটনার পর্যালোচনা); 'সানাইয়ের পোঁ' (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত আলোচনা ও প্রবন্ধ); 'সন্ধ্যা-প্রদীপ' (নারীমঞ্চ); 'শনির পত্র' (অনিয়মিত, সম্পাদককে লেখা পত্রাদি); 'হংস দূত' (অভিনন্দ-বার্তা ও আশীর্বাণী); 'নিক্তি-নিকষ' (অনিয়মিত, গ্রন্থ-সমালোচনা) ইত্যাদি। 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়– ১ম সংখ্যায় 'ধূমকেতু' কবিতা, 'সারথির পথের খবর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ; ২য় সংখ্যায় 'জাগরণী'; ৪র্থ সংখ্যায় 'রক্তাম্বরধারিণী মা'; ৭ম সংখ্যায় নজরুলের 'মোহররম' কবিতা, 'মোহররম' প্রবন্ধ, 'অগ্নিবীণা' ও 'ব্যথার দান' গ্রন্থ-দুটির বিজ্ঞাপন; প্রভৃতি। 'মোহররম' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন, '[...] যাঁরা ধর্মের জন্যে সত্যের জন্যে জান কোরবান করেছেন, আজ সেই বীরদের জন্যে ক্রন্দন অভিনয় করে আর তাঁদের আত্মার অপমান করো না নৃশংস অভিনেতার দল। তোমাদের ধর্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শমসের নাই, শির নাঙ্গা, তোমরা কোরআন কর পদদলিত, তোমার গর্দানে গোলামীর জিঞ্জীর, যে শির আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজদা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি আর তুমি করছ আজ সেই শহীদানের ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য 'মাতমের' অভিনয়। আফ্‌সোস–আফ্‌সোস মুসলিম। আফ্‌সোস!'[৫৭] অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ৮ম সংখ্যায় 'বিষ-বাণী'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, 'বাংলার বিপ্লবী যুগের প্রথম সেনানায়ক পুরুষসিংহ যতীন্দ্রনাথ'-এর জীবনী, 'কত কেরামত জানোরে বান্দা কত কেরামত জানো'-শিরোনামে প্রতিবেদন, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা, নজরুলের 'কামাল পাশা' কবিতা, 'পরদেশী পঞ্জী'তে বিশ্বের বিভিন্ন রসাল ঘটনা, 'ব্যাভেরিয়ায় বিদ্রোহ'-এর খবর, 'মুসলিম জাহান' বিভাগে 'কিল্লাফতে'-শিরোনামে তুরস্কের যুদ্ধের সংবাদ, 'হংসদূত' বিভাগে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের একটি পত্র, প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র ৯ম সংখ্যায় নজরুলের 'ম্যয় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধ; ১২শ সংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা, নজরুলের 'ব্যথার দান'-এর বিজ্ঞাপন; ১৩শ সংখ্যায় 'ধূমকেতুর পথ' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ; ১৫শ সংখ্যায় 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ'; ১৬শ সংখ্যায় 'রণভেরী' কবিতা; ১৭শ সংখ্যায় 'কামাল' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'দুঃশাসনের রক্ত' নিবন্ধ; প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ১৮, ১৯, ২০ ও ২১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের যথাক্রমে চারটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'আমি সৈনিক', 'নিশান বরদার', 'ভিক্ষা দাও' ও 'তোমার পণ কি'। আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর 'গান্ধী চরিত্র'-শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় 'ধূমকেতু'র ১৭শ' সংখ্যায়[৫৮], ১৯শ' সংখ্যায়[৫৯] (৩য় পৃষ্ঠায়), ২৯শ' সংখ্যায়[৬০] (৭ম পৃষ্ঠায়) ও ৩০শ' সংখ্যায়[৬১]। এরইমাঝে ঘটে যায় পুলিশী হানা, অফিস তল্লাসি, সংখ্যা বাজেয়াপ্তি, পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী, আটকাদেশ এবং চূড়ান্তভাবে নজরুলকে কারাগারে নিক্ষেপ। নজরুল কারারুদ্ধ হওয়ার পরও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত থাকলে তৎকালীন কর্ণধারদেরও কারাগারে বন্দী করার মাধ্যমে 'ধূমকেতু'র কণ্ঠরোধ করা হয়। পুলিশী ঝামেলা সত্ত্বেও 'ধূমকেতু'র ২২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এই সংখ্যার সারথি, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন অমরেশ

[৫৭] ধূমকেতু, ৭ম সংখ্যা।
[৫৮] টীকা: শুক্রবার, ১০ কার্তিক ১৩২৯, ২৭ অক্টোবর ১৯২২।
[৫৯] টীকা:১০ কার্তিক, ১৩২৯, শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর ১৯২২।
[৬০] টীকা: শনিবার, পৌষ ১৩২৯, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২২। এখানে লেখকের নামটি ছাপা হয় মৌলভী মোজাফফর আহম্মদ হিশেবে।
[৬১] টীকা: ১২ পৌষ ১০২৯, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২২।

কাঞ্জিলাল; এতে প্রকাশিত হয় নজরুলে 'অদর্শনের কৈফিয়ৎ'। তারপর, ৩২শ সংখ্যার পর, নজরুল পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'ধূমকেতু' বন্ধ হওয়ার আগে যাঁরা এই পত্রিকাতে লিখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), মুজফ্‌ফর আহম্‌দ (১৮৮৯-১৯৭৩), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৩২২-১৩৭০), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪), শৈলজা মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মিসেস আর. এস. হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), শৈলবালা ঘোষ জায়া (১৮৯৩-১৯৭৩), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৮০), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), হুমায়ুন জহীরুদ্দীন আমির-ই কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) প্রমুখ।

'ধূমকেতু'র আবির্ভাবকে সমকালীন পত্রপত্রিকা স্বাগত জানিয়েছিল। একমুঠো উদাহরণ:

দৈনিক 'বসুমতী'র মন্তব্য,

> বাঙ্গালা সংবাদ প্রকাশে হঠাৎ ধূমকেতুর উদয়ে অনেক প্লীহা চমকিয়া ছিল, না জানি কি হয়। [...] বাঙ্গালার নবীন কবি সুলেখক, সুগায়ক স্নেহাস্পদ কাজী নজরুল ইসলাম ভায়া ধূমকেতুকে মাঙ্গলিক বেশে সাজাইয়া বাহির করিয়াছিলেন, ইহাতে ভয়ের কিছুই নাই, কেবল নামটায় যা কিছু। আশা করি কাজী নজরুল ইসলাম সিদ্ধি লাভ করিবেন।[৬২]

'বাসন্তী' পত্রিকার মন্তব্য,

> 'ধূমকেতু' জাতির ও দেশের বাধা বিঘ্ন জড়তা ধ্বংস করিয়া দেশে নূতন প্রাণের উৎস আনয়ন করুক আমরা এই প্রার্থনা করি।[৬৩]

'আত্মশক্তি'র মন্তব্য,

> কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' বাংলার আকাশে উদিত হয়েছে। আমরা আমাদের আশীর্বচন দিয়ে সহযোগীকে তাঁর জন্মদিনে আহ্বান করেছি, আজও বাংলার পাঠিকার কাছে তাঁর ঠিকানার পরিচয় দিচ্ছি, ইনি সপ্তাহে দু'বার করে বাংলার আকাশে ওঠেন।[৬৪]

'প্রসূন' পত্রিকার মন্তব্য,

> বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্র 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। [...] সারথীর পথের খবরে প্রকাশ দেশের যারা শত্রু দেশের যা কিছু মিথ্যা ভণ্ডামী মেকী তা সব দূর করিতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী। 'ধূমকেতু'র এমন গুরু বা এমন বিধাতা, কেউ নেই, যার খাতিরে সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যা বা ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেবে।[৬৫]

'পরিদর্শক' পত্রিকার মন্তব্য,

> ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাতে অনেকেরই চমক ভাঙ্গিবে, নেশা অনেকেরই টুটিবে। কাজেই অত্যাচারী সাবধান হউন। তোষামদী সম্বত হউন, পদলেহী পদলেহন পরিত্যাগ করুন [...]।[৬৬]

নজরুল পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যাওয়ার দীর্ঘ নয় বছর পর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, কবির বন্ধু কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক পুনরায় 'ধূমকেতু' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন, সহসম্পাদক হিশেবে ছিলেন চণ্ডীচরণ গুপ্ত; এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় শনিবার, ৫ই ভাদ্র ১৩৩৮ বা ২২শে আগস্ট ১৯৩১ (Printed and Published

[৬২] দৈনিক 'বসুমতী', ১২ই মে ১৯২২।
[৬৩] 'বাসন্তী', ২রা ভাদ্র ১৩২৯।
[৬৪] 'আত্মশক্তি' ৩০শে আগস্ট ১৯২২।
[৬৫] 'প্রসূন', ১৮ই আগস্ট ১৯২২।
[৬৬] 'পরিদর্শক', ১০ই ভাদ্র ১৩২৯।

by K. N Bhowmik from Kaumadi Press 259-1, Upper chitpur Road, Calcutta); নগদ মূল্য ছিল এক-পয়সা, বার্ষিক দুই-টাকা। পত্রিকার টাইটেল পাতার উপরে, প্রত্যেক সংখ্যায়, লেখা ছিল 'কাজী নজরুল ইসলাম প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত'। এই পত্রিকার সঙ্গে নজরুলের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তবে তাঁর কিছু রচনা এতে ছাপা হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণীটিও। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ১ম সংখ্যায়[৬৭] প্রকাশিত হয়: ২য় পৃষ্ঠায় নজরুলের বইয়ের বিজ্ঞাপন এবং ১৬ পৃষ্ঠায় নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতুর আদি উদয় স্মৃতি' প্রবন্ধটি। নজরুলের পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র প্রকাশ লগ্নের স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি মঞ্জুষায় সে কথা হয়ত আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩২৯ সাল, শ্রাবণ মাস– "রাতের ভালে অলক্ষণের তিলক-রেখা"র মতই "ধূমকেতু"র প্রথম উদয় হয়। [...] দেশের নেতা অপ-নেতা হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দূরবীন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়– তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন আমার উপরে শিব ঠাকুরের আদেশ হইল, এই আনন্দ-রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন "ধূমকেতু"র ভয়াল নিশান। স্বরাজ-প্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। "ধূমকেতু"কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।'[৬৮] একই প্রবন্ধে নতুন 'ধূমকেতু' প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন, 'আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার "ধূমকেতু"কে আহ্বান করিতেছে। কোন্ রূপে "ধূমকেতু"র উদয় হইবে জানি না। তবু আশা আছে, যে ধূর্জটির জটাজুটে "ধূমকেতু" ময়ূর-পাখা, সেই ধূর্জটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ-যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নব-পথে চালিত করিবে। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ যোগাইব মাত্র।'[৬৯] এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী ও নরেন্দ্র দেব। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ২য় সংখ্যার[৭০] ৭ম পৃষ্ঠায় নজরুলের 'কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী'-শীর্ষক অভিনন্দন গীতিটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ৩য় সংখ্যার[৭১] ৩য় পৃষ্ঠায় নজরুলের চৌদ্দ-লাইনের 'জন্মাষ্টমী'[৭২]-শীর্ষক গানটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ও দেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি শেখর। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ৬ষ্ঠ সংখ্যার[৭৩] ৪র্থ পৃষ্ঠায় নজরুলের আরেকটি গান[৭৪] প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ৭ম সংখ্যায়[৭৫] (শারদীয় সংখ্যায়) প্রকাশিত হয় কবির দীর্ঘ একটি কীর্ত্তন[৭৬]। এই সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, অন্তর্ভুক্ত হয় নতুন কলাম হিশেবে নাট্যালোচনা। এই সংখ্যায় ছিল হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল' (সংখ্যার প্রথম রচনা); মহাত্মার ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে 'বড়লাট প্রাসাদে অর্দ্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকির মহাত্মা গান্ধী' (৭ম পৃষ্ঠায়); নজরুলের 'মৃন্ময়ী'[৭৭] কবিতা; রাজপুতনা জাহাজে মহাত্মার সঙ্গে মীরাবাঈর ছবি এবং গোলটেবিল বৈঠকের ছবিসহ মোট ৫টি ছবি (১১ পৃষ্ঠায়), যা পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলে। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ৯ম সংখ্যার[৭৮] ১ম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ও ছবি প্রকাশিত হয়; এতে নজরুলের কোনও রচনা ছিল না, তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপনও না। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ১০ম সংখ্যায়[৭৯] প্রকাশিত হয়: রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় কবিকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে তাঁর ছবি (৪র্থ

[৬৭] টীকা: ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল– ৫ই ভাদ্র ১৩৩৮, ২২শে আগস্ট ১৯৩১।
[৬৮] সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', ২২শে আগস্ট ১৯৩১।
[৬৯] সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', ২২শে আগস্ট ১৯৩১।
[৭০] টীকা: ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল– ১২ই ভাদ্র ১৩৩৮, ২৯শে আগস্ট ১৯৩১।
[৭১] টীকা: ৩য় সংখ্যার প্রকাশকাল– ১৯শে ভাদ্র ১৩৩৮, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১
[৭২] টীকা: 'তিমির বিদারি অলক-বিহারী/ কৃষ্ণমুরারী আগত ওই!/ টুটিল আগল, নিখিল পাগল/ সর্ব্বসহা আজি সর্ব্বজয়ী।'
[৭৩] টীকা: ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশকাল– ৯ই আশ্বিন ১৩৩৮, ২৩শে সেপ্টেম্বের ১৯৩১।
[৭৪] টীকা: 'কে পাঠালে লিপির দূতী/ গোপন লোকের বন্ধু গোপন/ চিনিতে নারি হাতের লেখা/ মনের লেখা চেনে গো মন।'
[৭৫] টীকা: ৭ম সংখ্যার প্রকাশকাল: ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮, ৩রা অক্টোবর ১৯৩১।
[৭৬] টীকা: 'সখি কেন হেরিলাম নব ঘন-শ্যাম/ কালের কালিন্দী কূলে/ সে যে বাঁশরীর তানে সকরুণ গানে/ ডাকিল প্রেম-কদম্ব মূলে।'
[৭৭] টীকা: 'মৃন্ময়ী' কবিতা: 'মাটীর দেশের মাটীর মানুষ/ আমরা মাটীর দেবী গড়ি/ মিটাই মনোবনের ভীতি/ চড়িয়া মাটীর সিংহোপরি।'
[৭৮] টীকা: ৯ম সংখ্যার প্রকাশকাল– ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩১।
[৭৯] টীকা: ১০ম সংখ্যার প্রকাশকাল– ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩১।

পৃষ্ঠায়); নজরুলের রসিক-রচনা 'বেয়াই-বেয়ান'[৮০]-শীর্ষক কমিক-যুগল (৫ম পৃষ্ঠায়)। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র ১১শ সংখ্যার[৮১] ৪র্থ পৃষ্ঠায় নজরুলের 'গান'[৮২] শিরোনামে ২টি গান প্রকাশিত হয়।

নজরুল পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, একে আশীর্বাদ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আশীর্বাণী নিয়ে পত্রিকাটির ৩২টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (তখন পণ্ডিচেরীতে ছিলেন) এবং আরও অনেককে পত্র লিখেছিল। বাণী তাঁদের নিকট হতে এসেও ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[৮৩] রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী (২৪শে শ্রাবণ ১৩২৯):

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।[৮৪]

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী 'ধূমকেতু'র প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ঠিক উপরে ছলছল করে ফুটে ওঠে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী নজরুলকে প্রেরণা জোগায় বিদ্রোহী সাংবাদিকতা করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ 'বুঝে নিয়েছিলেন যে সে [নজরুল] নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে-বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনীতিক আশীর্বাদ।'[৮৫] তাই হয়ত এই পত্রিকায় নজরুলের আপন স্বভাববৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটে; আর এর প্রকৃতি তাঁর স্বদেশী কবিতার মতই অগ্নিবর্ষী ছিল। নজরুলকে আশীর্বাদ করেছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও; তাঁর বাণী[৮৬]:

২৪শে শ্রাবণ, শিবপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের আশীর্বাণী:

---

[৮০] টীকা: কমিক-যুগল: (এক) 'বেয়ান! তোমার আলু-চেরা চোখে আমি ম'রে আছি/ (বলি, ও বেয়ান ঠাকরুন!)/ তোমার ফোক্‌লা দাঁতে প্রেমের বুলি/ শুনেই কাঁধে নিলাম তুলি'; (দুই) 'বেয়াই! আমি তাইত তোমার গোদাপায়ের শরণ যাচি।'

[৮১] টীকা: ১১শ সংখ্যার প্রকাশকাল– ৩রা পৌষ ১৩৩৮, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩১।

[৮২] টীকা: (এক) 'নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল।/ লুটাইয়া পড়ে দিবারাত্রির বাঘছাল/ আলো ছায়ার বাঘছাল।।' ও (দুই) 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা!/ জাগো স্বাহা সীমান্তে রক্ত-টীকা।।'

[৮৩] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[৮৪] ধুমকেতু, ১-৩২ সংখ্যা।

[৮৫] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

[৮৬] ধুমকেতু, ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩২।

ভাই পাগল

'ধূমকেতু' বের করেছ শুনে সুখী হলাম। 'ধূমকেতু'র জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছ, এরকম নিখরচা আশীর্ব্বাদ করার জন্যে আমি হাত উঁচিয়েই আছি। আশীর্ব্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যারা মেকী তাদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক, [...] আশীর্ব্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' জতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক, স্থিরমণি হয়ে বঙ্গ মাতার স্বর্ণ-সিংহান সাজিয়ে নিক, [...]।

ইতি

তোমার বারীন দা

'ধূমকেতু'তে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে মুজফ্ফর আহ্মদও পত্র লিখেছিলেন।

প্রথম পত্র:

ভাই সারথি!

তোমার 'ধূমকেতু' আমি রীতিমত পড়ছি, কিন্তু সত্যকথা বলতে কি; সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে যে জিনিসটি চাইছি, সেইটিই ওতে আমি পরিস্ফুটরূপে পাচ্ছিনে। আমাদের দেশের নির্যাতিত জনমন্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে। তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে তুমি তাদের বিষয়ে পরিষ্কার করে আজো কিছু বলনি। নির্যাতিত জনসাধারণ বলতে আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকদিগকেই বুঝি। এরা ছাড়া আর সবাই নির্যাতনকারী, নির্যাতিত নয়। আমাদের বেশীর ভাগ কাগজেই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা লিখছে। আর কাঁদুনীও তারা গাইছে– তাদের আপনাদেরই জন্যে। এই সেদিনও 'সনাতন' নামে একখানা কাগজ মধ্যশ্রেণীর বাঙালীর জন্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাজারে বার করেছে। কিন্তু ওই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা কি কম অত্যাচারী? দেশের দাসত্বের নিগড়কে সুদৃঢ় করার জন্য যতটা দায়ী জমিদার ও ধনী লোকেরা; তার চাইতে এতটুকুও কম দায়ী নয় এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা। আমাদের মরা-বাঁচাসমূহ নির্ভর করছে কৃষক ও শ্রমিকদের উপরে। কৃষকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে আমাদের খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে দিলে তবে আমরা বেঁচে আছি। আর মজুরেরা কারখানায় খেটে ব্যবহার্য নানাদ্রব্য প্রস্তুত করে দিলে তবেই সকলের সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সৈন্য সংগ্রহও করা হয়ে থাকে এ দু'শ্রেণীরই লোকের মধ্য থেকে। সংখ্যায়ও ওরা বেশী; বোধ হয় শতকরা ৮০ জনেরও উপরে। মোট কথা এই যে দুনিয়ারূপ মেশিনটা চলছে, এটার সমস্ত কলকবজাই কৃষক ও মজুরদের হাতে। ওরা চালালে তবে এ মেশিন চলবে– আর নানা চালালে একদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। এখন যে কৃষক আর শ্রমিক: ওদেরকে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মেরে রেখে দিয়েছে। শুধু ভাবের দিক দিয়ে নয়, মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও। এ অত্যাচারীরা নানাদিক থেকে, নানাভাবে অত্যাচার করে করে গরীবদের আর কিছু রাখেনি। সব কিছু যারা করছে– তাদেরকেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা কিছুই নয়। কর্মের সম্মান আমরা করতে জানিনে। তা যদি জানতেম, তাহলে এত দুর্দশা আমাদের কশ্মিনকালেও হত না। যে যত অলস সেই তত বেশী ভদ্রলোক, এই লক্ষ্মী ছাড়া দেশে আর যারা কাজের লোক তারাই সব ছোটলোক। চাষা আর মজুর শব্দই এদেশের ভাষার গালি।

কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনো ভেবেছ কি? একটা কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি– যদি ওদের কথা ভাবতে না শেখ তবে তোমাকে দিয়ে দেশের কোন সেবাই হবে না, প্রাণ দিলেও না। ওরাই দেশের শক্তি। ওদেরকে না জাগালে আত্মবোধ না শেখালে তোমাদের তথাকথিত 'ভদ্দর লোকেরা' কিছুই করতে পারবে না। কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। তারা জানে শুধু কৃষক আর শ্রমিকের মাথায়

কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে। পেটের জ্বালা ধনীর ঘরে যে সিঁধ কাটতে যায় সে চোর-সমাজে এর স্থান নেই– আর যুগ যুগান্তর ধরে কৃষকের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে খাচ্ছে– তারাই ভদ্রলোক সমাজপতি। শস্যের জন্মদাতা হয়েও কৃষকেরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। কলকারখানাতে ধনীরা প্রচুর লাভ করছে অথচ শ্রমজীবীরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পেরে– রক্ত বমি করে মরছে। কেন এমন হয়– সামান্য চিন্তাতেই তা বুঝতে পারবে। চিন্তার হাটে দেউলিয়া হয়েই ত আমরা দেশের সর্বনাশটা করেছি।[৮৭]

দ্বিতীয় পত্র

ভাই সারথি।

সেদিন যে পত্রখানা তোমায় পাঠিয়েছিলাম– সেখানা দেখলুম **১৩শ'** সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়ে গিয়েছে। তোমার কাগজের মারফতে আমার জন্মভূমির জনসাধারণকে যে আমার প্রাণের কথাগুলো জানিয়ে দিলে সেজন্য তোমায় আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বার্থপর লোকেদের কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু গুছিয়ে বলে উঠতে পারিনে। বলতে গেলে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। মানুষ মানুষের কি দুর্দশাই না করছে। নিত্য আমরা আমাদের চোখের সামনে কত শোচনীয় দৃশ্যই না দেখতে পাই। আর দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাই। আমাদের হৃদয় অসাড় হয়ে গেছে, ঘৃণিত স্বার্থের আওতায় পড়ে আমাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে, চিরদিনের জন্যে। এই কলকাতা শহরের কথাই বলছি। এখানে কতকগুলো লোক কোঠা-বালাখানতে বাস করছে– বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাচ্ছে– আর গাড়ী ঘোড়াতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সবকটা ইন্দ্রিয়ের অবিশ্রান্ত হুকুম তামিল করেও তাদের তৃপ্তি কিছুতেই হচ্ছে না; তারা কেবল চাইছে আর চাইছে। তাদের ভোগের ইন্ধন যুগিয়ে যুগিয়ে কত শত সহস্র লোক যে মাথা রাখার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত খুইয়ে বসেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। যেখানে মাথার উপর বিদ্যুতের পাখা না ঘুরলে অনেকের রাত্রিতে ঘুম হয় না, সেখানেই সকল ঋতুতেই সমানভাবে ফুটপাতে শুয়েই অসংখ্য লোক জীবনের দুর্বহ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে। খেতে না পেরে রাস্তার পাশে কত লোক মরে পড়ে থাকে– অথচ তা দেখে ধনীর মোটরের গতির এতটুকুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। এ সমস্ত চোখের সামনে দেখে দেখে বুক ফেটে যেতে চায় না কি? রাম যে মানুষ– শ্যামও সে মানুষ। পার্থক্যের মধ্যে এই যে রাম কোনো পরিশ্রম করে না– অথচ তার ভান্ডারে খাবারের কোনো অবধি নেই। আর শ্যাম বেচারা সেই ভোর হতে আরম্ভ করে রাত্রি পর্যন্ত খেটেই বাঁচে না। তার কিন্তু কোনো দিন খোদা চালান আর কোনদিন-বা সে খোদ চলে। অর্থাৎ যে দিন দু'মুঠো জুটলো সেদিনও খোদাই চালিয়ে দিলেন– আর যেদিন জুটল না সেদিন বেচারা খোদে অর্থাৎ কিনা নিজে চালিয়ে নিলে। মানব স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের মধ্যে কে এই এই বৈষম্যের সৃষ্টি করলে? হিন্দু বলবে, 'এটা পূর্ব জন্মের কর্মফল' আর মুসলমান বলবে, 'কপালের লেখা'। দিব্যি অক্ষমের সান্ত্বনা আর কি! মানুষের মনের ওপরে এই যে গোলামির ছাপটা পড়েছে- এতেই আমাদের দেশটা ধ্বংস হতে বসেছে। পূর্বজন্মে যারা পূণ্যের কাজ করেছিল, এজন্মে তারা ধনী হয়ে এসেছে, আর যারা খারাপ কাজ করেছিল তারা এসেছে পথের ভিখারী হয়ে। আচ্ছা, ধনের সাথে সাথে যে লাম্পট্য আর উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব হয় সেটাও কি পূর্বজন্মের পুণ্যফল? মুসলমানেরা পূর্বজন্ম মানে না কিন্তু একটা সান্ত্বনা তো চাই। তাই সমস্ত দোষ তারা শ্রষ্টার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তারা মনে করে থাকে যে, কপালের লেখা অনুসারে মানুষ ধনী-নির্ধন হয়ে থাকে শুধু তা নয়– মানুষ দুনিয়াতে এসব যা কিছু করবে– সে সমস্তই

[৮৭] 'ধূমকেতু', ২৬শে আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (১৩ অক্টোবর ১৯২২)।

নাকি আগে থেকে খোদা তাঁর দফতরের পাকা খাতায় লিখে রেখেছেন। এতটুকুও নড়চড় যে হবে তার কোনো উপায় নেই। ইসলাম কি এ অদ্ভুত শিক্ষা দেবার জন্যেই দুনিয়াতে এসেছে? কখনো নয়। সবকিছুর চাইতে সুন্দর আর শ্রেষ্ঠ করে ঈশ্বর মানুষকে যেন সৃষ্টি করেছেন– তেমনি স্বাধীনভাবে বিচার করবার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন। মানুষ ভালমন্দর বিচার করে কাজ করতে পারে বলেই এত পাপপুণ্য আর স্বর্গনরকের কথা উঠেছে। তা যদি না হত, তাহলে, পাপ আর পুণ্য কোনো কথারই সৃষ্টি হতো না। কেননা পরলোকে যা হবে তা যখন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, তখন মানুষ কেন এত বিচার করে কাজ করতে পারে? অত্যাচার সয়ে সয়ে মানুষ খোদাকে কত ছোট বলে ধারণা করে বসে আছে। খোদা ও কিছু আমাদের দেশের জমিদার আর মহাজন নয় যে যদৃচ্ছা গরীবদের মাড়িয়ে চলবেন?

আসল কথাটা কি জান ভাই? ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি যা কিছুই বল না কেন, সমস্তেরই একটা সীমা আছে– তাই দশজনের না কমলে একজনের কিছুতেই বেড়ে উঠতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেনি বলেই– যে যা কেড়ে নিতে পারছে– সেই তার মালিক হয়ে পড়ছে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হওয়াটাই যত অনর্থের মূল। এ জিনিসটা ধনী-দরিদ্রের সকলেরই মনকে ছোট করে দিয়ে থাকে। দশজনকে মেরে সকলেই চায় নিজে বড় হতে; আর এই যে বড় হওয়া, এটা সমাজও মাথা পেতে নিচ্ছে। মুসলমানেরা এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করেছিল। প্রথম খলিফা চতুষ্টয়ের সময়ে যে মুসলিমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটাকে ভিত্তি করেই বর্তমানের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবদ্ধ যা কিছুই বল না কেন গড়ে উঠেছে। হযরত ওমর (রা.) সাম্যের যে আদর্শ আপনার জীবনে দেখিয়ে গেছেন, তার তুলনা জগতে নেই। বর্তমান সময়ে রুশ সে আদর্শেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, অনেকটা সফলকামও যে না হয়েছে তা নয়। সাম্যের আদর্শ দেখিয়ে মুসলমানেরা বিশ্বজয় করেছিল। আর আজকের দিনে যে তারা এত হীনবল হয়ে পড়েছে সে শুধু সত্যের আদর্শ হতে অনেক দূরে সরে পড়েছে বলে। দেশের প্রকৃত শক্তিকে উপেক্ষা করে তুরস্ক কেবলই শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল কিন্তু আজ সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। 'বে' আর 'পাশারা' আজ আর শুধু তুরস্কের হর্তাকর্তা বিধাতা নয়; দেশের সে শক্তি অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকের আজ তাদের সাথে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে– আজ পাশা আর চাষাতে কোনো প্রভেদ নেই। তারই ফলে আজ মরু তুরস্ক বেঁচে উঠেছে। দেশ রিপাবলিক বা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেই কি দেশের লোকেরা সত্যকারের স্বাধীনতা পায়? ফ্রান্স ও আমেরিকার জনশক্তিও কি সত্যকারভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে? আমি এক হাজার বার বলব যে পায়নি। ফরাসী গণতন্ত্র আজো ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি। আভিজাত্য যেখানে আছে স্বাধীনতা সেখানে থাকতে পারে না। আমেরিকার সমস্ত সম্পত্তির মালিক ও দেশের সাত ভাগের এক ভাগ লোক বাকী ছয় ভাগের সবকিছু নির্ভর করছে, সেই এক ভাগেরই ওপরে। আমরা স্বাধীনতা পেতে চাই। কেমন স্বাধীনতা পেতে চাই সেটা আমাদের স্থির করতে হবে। কংগ্রেস বলছে শান্তির পথে আর বৈধ উপায়ে আমাদেরকে স্বরাজ পেতে হবে। কিন্তু সে স্বরাজের স্বরূপটা ছিল অশ্বডিম্ব? সকল মানুষ সমান অধিকার না পেলে স্বাধীনতাটা ধীনতা কিছুই হবে না। বিদেশীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা যেমন আবশ্যক তেমনি আবশ্যক আমাদের দেশীয় ডাক্তারদের হাত হতেও দেশের প্রাণ শক্তিকে উদ্ধার করা। আমাদেরকে ঘরে বাইরে সংগ্রাম চালাতে হবে।[৮৮]

তৃতীয় পত্র:

[৮৮] 'ধূমকেতু', ৭ই কার্তিক ১০২৯ বঙ্গাব্দ।

প্রিয় বন্ধো,

তোমায়ও বারবার বলেছি, দেশের যারা প্রাণ শক্তি তাদেরকে সাথে না নিয়ে দেশের কোনো কাজ করতে যাওয়ার মত আর বোকামি নেই। তোমার ভদ্রলোকেরা কোন কালেও দেশ উদ্ধার করতে পারবে না; সে আমি আগেও বলেছি। এখনো বলছি। সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার হতে এসে ইংরেজ যে এদেশ শাসন করছে। তার কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই? সে কি শুধু তোমাদের প্রেমে পড়ে শত হাজার মাইল দূর হতে এখানে এসে বসে আছে? তেমন বোকা ছেলে ইংরেজ নয়। আমাদের এই ভারতবর্ষটা একটা কামধেনু বিশেষ। একে দুহিলে কিছু না কিছু দুধ পাওয়া যেয়েই থাকে। আর এই দুধের খাতিরেই এত আটঘাট বেঁধে ইংরেজ এদেশে এসে বসে আছে। আজ দার্দানেলিস প্রণালীর জন্যে যে ইংরেজের এত মাথা ব্যথা উপস্থিত হয়েছে সে শুধু ভারতের পথটা নিষ্কণ্টক রাখারই জন্য। মিসরের স্বাধীনতা যে ইংরেজ কেড়ে নিয়েছে সেও শুধু এই ভারতের জন্য। ইংরেজ আমাদের দেশে আছে কিছু অর্থ লংফ্যানের জন্য; অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, এদেশে যে ইংরেজ শাসন এটা খাঁটি মূল ধনের শাসন। তাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হলে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে মূলধনেরই বিরুদ্ধে। শাসনতন্ত্র: সে ত ভাই মূলধন ওয়ালাদের চাবি, যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই ঘুরবে। ঠিক জায়গায় যা না মারলে কাজ হবে কেন? মূলধনওয়ালারা নাচছে কুদছে, কাদেরকে নিয়ে? আমাদের শ্রমজীবীদের নিয়ে নয় কি? তাদেরকে বাদ দিয়ে ওদের এক পাও এগুবার ক্ষমতা নেই। অথচ ওদের ওরা যা দুর্দশা করে রেখেছে তাও প্রতিদিন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো। আমাদের কংগ্রেসের বাবুরা ওদের ত্রিসীমান্তে ঘেঁষতে যাবেন না, কেন, কুলিগুলো কি আবার মানুষ? ওদের পা থেকে যে গন্ধ বেরোয়? মোটর হাঁকিয়ে রেলওয়ে গাড়ীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করে ওঁরা দেশোদ্ধার করছেন। এই আড়াই বছরে ফল যা দাঁড়িয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ। কারণ আর কাকে বলে? এইসব বিলাসী বাবুরা আবার করবেন কিনা দেশোদ্ধার।

ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের ধর্মঘট ভেঙ্গেই গিয়েছিল। পয়সার অভাবে কর্মীরা বেশীদিন দাঁড়াতে পারলে না, তার ওপর মতলববাজ লোকের চালও ছিল ওর পেছনে। ধর্মঘট করে যা তারা চেয়েছিল তা তারা পায়নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ কত হয়েছে তা জান? মোটে দেড়কোটি টাকা। এই দেড় কোটি টাকা ক্ষতি করাতে কর্মীদের ক্ষতি হয়েছে সাত লক্ষেরও কম। গবর্নমেন্টের ঘাড়েও খুব মোটা ক্ষতি চেপেছে। আশ্চর্য এই যে আমাদের দেশের লোকেরা তথাপি ধর্মঘট ধর্মঘটকারীদের সাহায্য করতে চায় না।

যাদের সাথে আমাদের লড়াই। যে পথে চললে– তাদেরকে আমরা হীনবল করে দিতে পারব সেই পথেই আমরা চলতে চাই না। কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়লে আর গলাবাজি করলে কি কোনো দিন স্বরাজ পাওয়া যাবে? কংগ্রেস সতের লক্ষ টাকার বরাদ্দ করেছে খদ্দর প্রচার করার জন্য। এই সতের লক্ষের অর্ধেকও যদি ই. আই. আরের ধর্মঘটকারীরা পেত তাহলে কি অসাধ্য সাধনই করতে পারত– বল 'দেখি' যে রোগের যে ঔষধ সে ওরা করতে চায় না। কি মুস্কিল! বর্তমানে যে প্রণালীতে খদ্দের প্রচার হচ্ছে– তাদের দেশের গোলামী বেড়েই যাবে; কমবে না এতটুকুও। গান্ধীজী যা বলেছিলেন– অর্থাৎ সকল পরিবার নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য সুতা কাটবে আর কাপড় বুনবে তা যদি হত তবে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন যে প্রণালীতে খদ্দর চালানো হচ্ছে– সে ত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। গরীবদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম নিয়ে কতগুলো লোক পেটমোটা করছে। এরই নাম খদ্দের প্রচার, আর এতেই নাকি স্বরাজ পাওয়া যাবে। হায়রে বুদ্ধি। তাই তোমাদের ঘাড়ে যে 'কর্ত্তার ভূত'টি চেপে বসে আছেন তাকে কোনোরকমে

খানিকটা সময়ের জন্য হলেও নামিয়ে দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি যা বলুম তা সত্য কি না।[৮৯]

নজরুলের অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধের সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মত রাজনৈতিক তরুণ প্রজন্মের লেখাও এতে অন্তর্ভূক্ত হয়; ফলে 'ধূমকেতু' প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের তরুণদের চিত্ত জয় করে নেন নজরুল। অল্পদিনের মধ্যেই 'ধূমকেতু' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, 'বিক্রির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দাদন দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে– কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।'[৯০] জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে 'ধূমকেতু' ছাড়িয়ে যায় 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তি' পত্রিকাগুলিকে; যদিও এ ছিল একটি রাজনৈতিক স্বল্পায়ু পত্রিকা, আর একে কেন্দ্র করে কোনও সাহিত্যিকগোষ্ঠী হয়ত গড়ে উঠতে পারেনি, তবুও পত্রিকাটি জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব সাফল্যতা অর্জন করে; এর প্রধান কারণ, আগেই বলা হয়েছে, নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সংবাদ উপস্থাপনার কলাকৌশল; এরসঙ্গে সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ একটি ধারাও, যা নজরুলের ভঙ্গি ও রীতির বহিঃপ্রকাশ; অর্থাৎ রসাত্ত্বক ভঙ্গি– মিশ্রিত কৌতুক আর নব নব সংবাদ-রস সৃজন; ফলে এই পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল নবপ্রজন্মের আত্মাকে জয় করে, বিপ্লবীদের সহানূভুতি ও সমর্থন অর্জন করে নিলেন; তাই হয়ত নজরুল এই পত্রিকার মাধমে স্বাদেশিকতার পক্ষে তাঁর বৈপ্লবিক চেতনার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হন, বিশেষ করে, বিদেশী শাসন উৎখাত করার উদ্দেশ্যে কলম চালাতে সক্ষম হন। ভাষা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ক্ষুরধার কথা ও বাণী প্রকাশের কারণে তিনি শাসকশ্রেণীকে বিচলিত করে তুলেন। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতার পাশাপাশি সামাজিক রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধেও সমান তীব্রতায় কলম চালান তিনি। তিনি হয়ে উঠেন 'ধূমকেতু'র সত্যিকার 'সারথি' (১ম-৭ম সংখ্যা পর্যন্ত 'সম্পাদক' ও ৮ম সংখ্যা থেকে 'সারথি' রূপে তাঁর নাম প্রকাশ পায়)।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলে। ব্রিটিশ সরকার এই দাবী মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রূতিও দেয়, এমনকি ভারতবর্ষের মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্যে একদফা এগিয়ে গিয়ে তুরস্কের খেলাফৎ রক্ষার অঙ্গীকার করে বসে। যুদ্ধ শেষে এই প্রতিশ্রূতিগুলি পালন করতে সরকার নারাজ হলে শুরু হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ঘটতে থাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভারতবর্ষের জনশক্তির একটি বড় অংশ ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে শুরু করে খেলাফৎ আন্দোলন, অংশ নেয় অসহযোগ আন্দোলনে। প্রাথমিক উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও কার্যত এই আন্দোলনগুলি ব্যর্থ হয়ে যায়। একদিকে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে যুক্তপ্রদেশের গোরষ্ঠপুর জেলার চৌরিচৌরা থানার একজন দারোগাসহ কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করেন, অন্যদিকে অনেক মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে খেলাফৎ আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের আকালী আন্দোলন ছাড়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আর কোনও আন্দোলনই সক্রিয় ভুমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি, ফলে দেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে শূন্যতা ও হতাশার ছায়া নেমে আসে। 'ধূমকেতু'র মধ্য দিয়ে অসহযোগ-খেলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ভারতবর্ষের যে হতাশার সৃষ্টি হয় তাই নজরুল তাঁর স্বদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যায়ই তাঁর 'ধূমকেতু' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, যা ছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকার মুখবন্ধ; আর 'ধূমকেতু'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছিল 'সারথির পথের খবর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। নজরুল একজন স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক, তাই তাঁর কালের প্রয়োজনে তিনি তাঁর দেশের জনমানসের বিক্ষোভ ও অস্বস্তি প্রবন্ধের মাধ্যমে তীব্রভাবে প্রকাশ করেছিলেন;

[৮৯] 'ধূমকেতু', ১৪ই কার্তিক ১৩২৯ (৩১ অক্টোবর, ১৯২২)।

[৯০] ধূমকেতুর নজরুল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এমনকী তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন ভারতবর্ষের মানুষ মুক্তি চায়, যা তাঁরও মূল উদ্দেশ্য– একদিকে বিদেশী শক্তির কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ, অন্যদিকে সামাজিক অচলাতয়নের করতল থেকে মুক্তি লাভ; তাই তিনি 'ধূমকেতুর পথ'-এ লিখেছেন,

> সর্বপ্রথম, ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তা'তে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হ'য়ে এদেশে মোড়লী ক'রে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।/ পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।[৯১]

'অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছা-ছোলা ভাষায় খবরের কাগজের ঘোষণা ক'রে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার [মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের] জানা নেই।'[৯২] ফলে 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধটিকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল, বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ– সেকথা ঘোষণা করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেননি। দেশের রাজনৈতিক নিস্তব্ধতার তরঙ্গ ভাঙার পটভূমিতে নজরুল 'ধূমকেতু'র উদয় ঘটান। অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ঝিমিয়ে-পড়া ও নৈরাশ্যপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নজরুল যে দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ইতিহাসে অতুলনীয়। একই প্রবন্ধে, তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে বলিষ্ঠ ঘোষণা করে, এমনকী গান্ধীজীর তীব্র সমালোচনা করে, লিখেছিলেন,

> 'ধূমকেতু' এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে, দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হ'তে চায়, অন্ততঃ তারা যেন সর্বাগ্রে এই দুর্বলতা, এই লোভটুকু জয় করবার ক্ষমতা অর্জন ক'রে তবে কোন কাজে নামে। সত্যকার প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তা'তে পণ্ডই হয় বেশী। অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে নেমে ছিলেন। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে নেমে ছিলেন ব'লে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না। আপনি সড়ে পড়লেন। [...] ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চল। [...] ইংরেজের সহযোগিতা ক'রে যদি দেশ উদ্ধার হবে ব'লে তুমি প্রাণ হ'তে নিজে ফাঁকি না দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তাই কর, কারুর নিন্দা ও অপবাদকে ভয় ক'রো না। কিংবা যদি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর, তাই বল বুক ফুলিয়ে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তা'তে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরেজের মার, তা'তে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চরবে, মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয় তা'তে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্ত রের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হ'য়ে ওঠে, তখন নির্যাতনের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুঁতে নিভে যায়।[৯৩]

[৯১] ধূতকেতুর পথ, কাজী নজরুল ইসলাম।
[৯২] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।
[৯৩] ধূতকেতুর পথ, কাজী নজরুল ইসলাম।

'ধূতকেতুর পথ' প্রবন্ধে নজরুল ভারববর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, বরং তিনি তাঁর যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, তুলে ধরেছেন বাংলার বিপ্লবীদের জীবন গাঁথা। নজরুল 'ধূমকেতু'র মাধ্যমেই স্তিমিত হয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের তেজ আবার জাগ্রত করে তুললেন; তুলে ধরেছেন প্রলয় ও ধ্বংসের মাঝে যে নবসৃষ্টির উল্লাস থাকে তাও, তিনি তাঁর 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' প্রবন্ধে এই প্রকাশ করেছেন,

> তোমাদের জন্যে গৃহ নাই, তোমাদের জন্যে দয়া নাই, করুণা নাই, এই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, [...] এস আমার অনাদৃত লাঞ্ছিত ভাইরা, আমরাই নতুন করে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি করব! শনি হবে আমাদের কপালে জয়টিকা, 'ধূমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়ে, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ। এস– এস আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল! ত্যক্ত শতমুখী আমাদের বিজয়কেতন, মড়ার মাথা আমাদের রক্ত দেউল-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, গরল আমাদের তৃষ্‌ঞ্চার জল, দাবানল-শিখা আমাদের মলয়-বাতাস, নিদাঘ-আতপ আমাদের তৃপ্তি, জাহান্নাম আমাদের শান্তিনিকেতন। এস আমার শনির শাপদগ্ধ ভাইরা! [...] মহামারী, মারীভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে।[৯৪]

'ধূমকেতু'-তে প্রকাশিত নজরুলের কয়েকটি উল্লেখ্য যোগ্য প্রবন্ধনিবন্ধ হচ্ছে: 'ধূমকেতুর পথ' (১৩ অক্টোবর ১৯২২), 'কামাল' (২৭ অক্টোবর ১৯২২), 'আমি সৈনিক' (৩১ অক্টোবর ১৯২২), 'ভিক্ষা দাও' (৭ নভেম্বর ১৯২২), 'তোমার পণ কি!' (১০ ডিসেম্বর ১৯২২), 'রাজবন্ধীর জবানবন্দী' (২৭ জানুয়ারি ১৯২৩); এসব প্রবন্ধনিবন্ধে নানাভাবে নজরুলের দেশ ও জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে; তিনি তাঁর আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশে ছিলেন নির্ভয় ও অকুণ্ঠ; তিনি কখনও রূপকের ছলে, কখনও-বা কল্পিত ক্ষুদ্রকাহিনীর আওতায়, আবার কখনও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন, যদিও তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও আহবানের ভাষা নিঃসন্দেহে ছিল তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগে আক্রান্ত। 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?' প্রবন্ধে তিনি তাঁর দেশের দুর্দিনে, তাঁর স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য, তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি দু'হাত মেলে আহ্বান জানিয়েছেন, তাই ত লিখেছেন,

> হে আমার গহন বনের তরুণ-পথিক দল! আজ সেই বনানী-কুন্তলা ভৈরবী-সূতা আবার বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে– চোখ তার অসঙ্কোচ দৃষ্টির ক্ষুর ধার, ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক, হাতে তার অভয় তরবারি– সে আবার জিজ্ঞাসা করছে– 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ? উত্তর দাও, হে আমার তরুণ পথ-যাত্রী দল! ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা। বল্, তোরাও কি আজ সৌন্দর্য্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথ-হারা পথিকের মত মৌন নির্বাক চোখে ঐ ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি?[৯৫]

এখানে নজরুল তাঁর দেশমাতৃকার জন্যে উৎসর্গীকৃত তরুণ বিপ্লবীদের চিত্র পৌরাণিক রূপে অঙ্কিত করেছেন। এরকমই অনেকগুলি অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে নজরুল তাঁর জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগিয়ে ছিলেন। নজরুলের প্রবন্ধগুলি এক দীপকরাগে বাঁধা, যা তাঁর আবেগ ও বলিষ্ঠ-কণ্ঠকে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধ, তিনি লিখেছেন,

> এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হতে পারবে। [...] দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালবেশে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হ'লে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে। [...] রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাঙলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্যে বাংলার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে।

[৯৪] আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, কাজী নজরুল ইসলাম।

[৯৫] পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?, কাজী নজরুল ইসলাম।

> কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।[৯৬]

নজরুল আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে মহাপুরুষ অপেক্ষা সৈনিকের কর্তব্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আর তিনি একইসঙ্গে তাঁর সৈনিক ও বিদ্রোহী সত্ত্বার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। 'নিশান-বরদার' সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও দেখা যায় একই ঘোষণা,

> ওঠ, ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাধারী বীর সৈনিকদল। ওঠ, তোমাদের ডাক পড়েছে– রণ-দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে; তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। [...] আমাদের বিজয় পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছাব না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন নিয়ে কাপড় ছোপাই, খুন নিয়ে নিশান রাঙাই। বল আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম, জয়। বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।[৯৭]

আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুল ব্রিটিশ শাসকের পতাকা পুড়িয়ে ফেলে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঘোষণার এবং রক্ত দিয়ে রাঙানো লাল পতাকা উড়ানোর আহ্বান জানান। 'ভিক্ষা দাও' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নজরুল তাঁর দেশের জন্যে একটি সোনার ছেলে ও মাতাল প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে লিখেছেন,

> ভিক্ষা দাও! ওগো পুরবাসী ভিক্ষা দাও! তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও। আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলবে আমি ঘরের নই; আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের। [...] তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নাই যে বলতে পারবে আমি আছি; সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও! তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।[৯৮]

নজরুল 'ধূমকেতু'র ৮ম সংখ্যায় তাঁর বহ্নিদীপ্ত প্রবন্ধ 'বিষ-বাণী'তে তরুণদের অত্যাচারকে ধ্বংস করতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন,

> ভয় নাই– ওগো আমার বিষ-মুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনীপুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ যুগ সঞ্চিত কাল-বিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেলো। তোমাদের বিভূতি-বরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজরাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর- হে আমার তিক্ত-চিত্ত ভূজগ তরুণ দল। তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? [...] এস আমার মণি-হারা কালফণীর দল, তোমাদের প্রেমের কেতকী কুঞ্জ ছেড়ে, অথকার বিবর ত্যাগ করে। এস, মায়ের আমার শ্মশান শায়িত আঘাত জর্জরিত মৃত্যু-শয্যা পাশে। হয় মৃত-সঞ্জীবনী আন, নয় ভাল করে চিতাগ্নি জ্বলে উঠুক।[৯৯]

আলোচ্য প্রবন্ধে বিপ্লবীদের তৎপরতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আর নজরুল 'ক্ষুদিরামের মা' প্রবন্ধটি বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামকে নিয়ে লিখেছেন,

---

[৯৬] ধূমকেতু, ১৩২৯, ১৪ কার্তিক সংখ্যা।
[৯৭] ধূমকেতু, ১৩২৯, ১৭ কার্তিক সংখ্যা।
[৯৮] ধূমকেতু, ১৩২৯, ২১ কার্তিক সংখ্যা।
[৯৯] 'বিষ-বাণী', ধূতকেতু, অষ্টম সংখ্যা।

> ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হ'য়ে। তোমরা চিন্‌তে পারছ না। তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে– তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের– আমাদের লক্ষীছাড়ার দলের, ওরা ঘরের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয় ফাঁসির। ঐ যে কণ্ঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরছ, ঐ কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকান আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়– ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার।[১০০]

নজরুলের এসব প্রবন্ধে তাঁর স্বদেশের জন্য আত্মদান ও মুক্তির জন্য আগুন ঝরানো বক্তব্য প্রাধাণ্য পেয়েছে; এছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল একদিকে যেমন লিখেছিলেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ তেমনি অন্যদিকে লিখেছিলেন অন্ধ, রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। লিখেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আর গণবিপ্লব ও নারী জাগরণের সপক্ষে। সব মিলে 'ধূমকেতু' একটি পরিপূর্ণ বিদ্রোহী চরিত্রের পত্রিকা হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'ধূমকেতু' পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক চেতনা যুক্ত একটি কাগজ ছিল, যা ছিল নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক; নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশ পায়, তিনি 'আমার পথ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হ'ল। আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি– নমষ্কার ক'রছি আমার সত্যকে। [...] দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী [...] 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।[১০১]

নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির পক্ষে সংগ্রাম ব্যর্থ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্যে, ফলে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে তাঁর দেশের জন্যে বড় অভিশাপ, তাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেই হবে। এসব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' দুটি প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। সাম্যবাদ, মানবতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় আপ্লুত নজরুলকে আবিষ্কার করা যায় তাঁর 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে, তিনি লিখেছেন,

> দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মজজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল। [...] মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্ত কলঙ্করেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর?[১০২]

নজরুল চান তার সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে মানবতার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তুলে নিয়ে আসতে। তাই বন্ধ করতে চান মন্দির ও মসজিদ নিয়ে হানাহানি। কামনা করেন, সর্বতোভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পরিণামে স্বাধীনতা লাভের অমৃত স্বাদ লাভ করা। নজরুল সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন নিজ প্রতিভার সাহায্যে, তাঁর সমস্ত শক্তির প্রয়োগে, মানব মনে সকল সম্প্রদায়ের মিলনের গান গেয়ে দেশ ও জাতির কলঙ্ক মুছতে। নজরুল যেমন একদিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত তেমনি অন্যদিকে মানুষকে ধর্মের আল্লখালা থেকে বের করে নিয়ে এসে মনুষ্যত্বের চিরমুক্ত আকাশতলে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, দূর করতে চেয়েছিলেন বিভেদের টিকি আর দাড়ি, বৈষম্যের দুরপনেয় কলঙ্ক, তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে এরই আভাস পাওয়া যায়,

---

[১০০] ক্ষুদিরামের মা, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১০১] 'আমার পথ', ধূমকেতু, ১১ অগস্ট ১৯২২।
[১০২] মন্দির ও মসজিদ, কাজী নজরুল ইসলাম।

ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে ব'লেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। [...] হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্যাত্ব। এই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে সেটাও পণ্ডিত-মোলায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনদিনই ঠোঁকাঠুঁকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের উপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম মিশে গিয়েছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আলা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি দাড়ির উপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা, আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো। [...] অবতার পয়গাম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি– আলোর মত সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রীষ্ট হ'য়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনও ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।[১০৩]

তদানীন্ত ভারতবর্ষের শুধু মাত্র বাংলাদেশেই প্রতি বছর দশ লক্ষ মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি, মন্বন্তর-মহামারী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রাণ হারায়। নজরুলের দুঃখ এখানে যে, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা না ভেবে, এই মরণযন্ত্রের প্রতিকারের কথা না ভেবে, মানুষ পশু প্রবৃত্তির সুবিধা নিয়ে ধর্ম-মদান্ধদের নাচিয়ে কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষে পরিণত হচ্ছে। নজরুল লিখেছেন,

যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,– তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ– স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি।[১০৪]

মন্দির নয়, মসজিদ নয়, হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়; নজরুলের আত্মা জুড়ে বিরাজিত একমাত্র মানুষের কল্যাণ কামনাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষ। মনুষ্যত্বই হচ্ছে মূল ধর্ম। মানবতার ধর্ম। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান বলে কিছু নেই। সবাই মানুষ। নজরুল লিখেছেন,

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, আমার মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হ'য়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার ক'রে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটি হিন্দু তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুন্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি– আমারই মত একজন মানুষকে।'[১০৫]

নজরুল কিন্তু ভয়হীন চিত্তে একদিকে শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ আর অপরদিকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের জড়তা, দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তার শক্তিশালী লেখনী চালাতে থাকেন। তিনি একটি রূপকের মাধ্যমে দেশমাতৃকাকে ভুখারিনী মা-রূপে দেখিয়ে 'ম্যয় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন; এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

[১০৩] 'হিন্দু-মুসলমান', কাজী নজরুল ইসলাম।
[১০৪] মন্দির ও মসজিদ, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১০৫] হিন্দু-মুসলমান, কাজী নজরুল ইসলাম।

> তরুণের দল ভীম হুঙ্কার করে উঠল, 'বেটী রক্ত চায়, বেটী রক্ত চায়!' মহা উৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে– তারা যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হল মায়ের ছেলেরাই।[১০৬]

যে মা অন্ন চায় না, বস্ত্র চায় না সেই মায়ের পূজার বলি হল তারই সন্তানরা, যাদের কারও গলায় ফাঁসীর দাগ, কারও কণ্ঠে ঘাতকের হানা খড়্গ-রক্তের লাল দাগ। এই প্রবন্ধে নজরুল রূপকের মাধ্যমে আরও চিত্রিত করেছেন যে, দেশমাতৃকার ডাকে তার মুক্তির জন্য তার সন্তানরা সহজেই তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়। নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নব্য তুর্কী বীর কামাল পাশার প্রশস্তিসূচক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; এতে লিখেছেন,

> দাড়ি রেখে, গোস্ত খেয়ে, নামাজ রোজা করে যে খিলাফৎ উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল [...] দেখলে বাবা, যত পেলায় দাড়িই রাখি আর উঠবোস করে যতই পেটে খিল ধরাই, ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই, [...] ও সব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না, ইসলামের বিশেষত্ব তালোয়ার [...]।[১০৭]

'কামাল' প্রবন্ধে ইসলামিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নজরুল তলোয়ার নিয়ে ঈমানের যুদ্ধে, মানুষের মুক্তির যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার আহবান জানান। এখানেও তিনি ধর্মের আনুক্ষানিকতার প্রতি ভ্রূকুটি হানেন। সত্যিকার মুসলমানের মধ্যে তিনি ইসলামিক চেতনার রক্ত কেতন উড়ানোর জন্য আহবান জানান। দাড়ি না রেখে, গোশত খেয়ে নামাজ রোজা করে যে খেলাফত উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না 'কামাল'-এর এই বোধ অনুপ্রাণিত করে নজরুলকে। তাই তিনি লিখেছেন,

> আল্লাহর আরশ কাঁপাতে হলে হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্রষ্টারও পিলে চমকিয়ে দেয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না। ইসলামের বিশেষ তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ রোজাও নয়।[১০৮]

নজরুলের 'বিদ্রোহী' সুর এখানে ঝংকিত হলেও এরমধ্যে ইসলাম প্রীতি তথা ইসলামিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য লক্ষণীয়। একারণেই নজরুলের প্রবন্ধে সাম্য ও মানবতা সুস্পষ্ট; সৈয়দ আকরাম হোসেন বলেছেন, 'তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবপ্রতির অকৃত্রিমতা, রোমান্টিক অস্পষ্ট স্বপ্নলয় কোন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চেতনা থেকে উৎসারিত নয়, বরং তা উদ্বোধিত হয়েছে, ভাববাদী চেতনালোক থেকে।' ভাববাদী মানবতা রোমান্টিক স্বপ্ন চেতনা আবেগী অনুভবতন্ত্রীসমূহ, রাজনৈতিক সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে নজরুলকে অস্থির করে তুলে। 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন,

> এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল! তোমাদের পলক-হারা রক্ত-চাওয়ার যাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেলি, তোমাদের বিপুল নিঃশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আন ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহল-জ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক। রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষ-দাহনে নিবিড় কা"ল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবীর রঙে রেঙে বিষ ঐ মহাসিন্ধুর, নদ-নদীর বারি-রাশির মাঝে-টগবগ করে ফুটে উঠুক এই বিপুল জলরাশি– আর তার বুকে তোমাদের বিষ-বিন্দু বুদবুদ হয়ে ভেসে বেড়াক।[১০৯]

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' প্রবন্ধের অনুরূপ আবেগের সন্ধান পাওয়া যায় 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক' প্রবন্ধেও। একই আবেগের সন্ধান পাওয়া যায় 'স্বাগত' নিবন্ধেও,

---

[১০৬] ম্যয় ভুখা হুঁ, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১০৭] ধূমকেত, কামাল, ২৭ অক্টোবর ১৯২২।
[১০৮] ধূমকেত, কামাল, ২৭ অক্টোবর ১৯২২।
[১০৯] তুবড়ী বাঁশীর ডাক, কাজী নজরুল ইসলাম।

> জ্বালিয়ে রেখিছি এই শ্মশান-চিতার হোম-শিখা; এস ঋষি, হোতা হও। এস তবে, কপালে শ্মশান-ভস্মের পাংশু টিকা পরিয়ে দিই।[১১০]

'মারা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে স্বরাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে,

> স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কারুর অধীন নাই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই।[১১১]

এক কথায়, নজরুল যেমনি তাঁর কাব্য চেতনায় বিদ্রোহী হয়েও রোমান্টিক, তেমনি 'ধূমকেতু'র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই রোমান্টিক আবেগের তাড়না বুকে নিয়েই তিনি বিপ্লবী, অস্থির, অশান্ত; সহিষ্ণুতা তাঁর স্বভাব-বিরোধী; তাই তাঁর সাংবাদিকতার কাল দীর্ঘ হয়নি, অবশ্য অসুস্থতাও এর অন্যতম কারণ; তবু নজরুল সাংবাদিকতার স্বল্প সময়ে যে বিদ্রোহী ও আধিপত্যবাদ-বিরোধী চেতনার উন্মুক্ত করেছেন তা সর্বাধিক বিচারে অনন্য। 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিশেবে নজরুলের প্রবন্ধগুলি অতিমাত্রায় কাব্য-গুণান্বিত, তবে দেশের যৌবনরক্তে এইসব দুঃসাহসিক ও নির্ভীক প্রবন্ধ যেরকম আবেগ ও উদ্দীপনার অগ্নিসৃষ্টি করে তা অবশ্য স্বীকার্য।

'ধূমকেতু' মুষড়ে-পড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে অনেক পরিমাণে উদ্দীপ্ত ও শক্তিশালী করে তুলে; ফলে যেমনি অনুশীলন ও যুগান্তর-পার্টির অনেক নেতা 'ধূমকেতু'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন, তেমনি 'ধূমকেতু'র তুচ্ছ তাড়নায় অস্থির হয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার নজরুলের কণ্ঠারোধ কারার ফিকির খুঁজতে থাকে। 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত বেশ কিছু রচনার জন্যেই নজরুলকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ নজরুলের গতিবিধি এবং তার রচনাদি সম্পর্কে বিশেষে খোঁজখবর নিয়ে নিয়মিত মনিটর করে রিপোর্ট পাঠাতে থাকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে স্যার সিসিলকে, ২১শে নভেম্বর ১৯২২ থেকে ১০ই মে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে, পাঠানো এইরকম একটি প্রতিবেদনে লেখা হয় যে, ওরা [কম্যুনিস্টরা] সরাসরি প্রচার কাজ শুরু করে। তাদের বিশেষ সংবাদপত্র 'ধূমকেতু' তিনবার অভিযুক্ত হয় এবং দুই সম্পাদকের শাস্তিও হয়।[১১২] স্যার সিসিলের রিপোর্টে ভুল করে দু'জন সম্পাদকের কথা লেখা হয়। আসলে এদের মধ্যে একজন প্রকাশক। অন্যজন সম্পাদক; স্বয়ং নজরুল। বাংলা সরকারের ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের ১০৯/১৯২৩ নম্বর ফাইলে 'বলশেভিক' প্রচারকার্যে লিপ্ত বাংলা দেশের যে-সব পত্র-পত্রিকার তালিকা দেওয়া হয় তাতে একেবারে এক নম্বরেই নজরুলের 'ধূমকেতু'র কথা উল্লেখ করে লেখা হয়, 'The Dhumketu:- Its editor Nazrul Islam has since been convicted u/s 124 I.P.C. ... and sentenced to 1 year R.I. Amaresh Kanjilal who succeeded Nazrul as the editor has also been prosecuted u/s 124 I.P.C. The case is pending.'[113] এই নথির উপযুক্ত অনুচ্ছেদের বাঁ পাশের মার্জিনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিস্টার রবার্টসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে একটি আলাদা ফাইল খোলার জন্য। শেষপর্যন্ত পূজার সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে'র জন্যে নজরুলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহমূলক মোকদ্দমা করা হয়। বিচারে নজরুল এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি কোর্টে যে জবানবন্দী দেন তা শুধু একজন সত্যকার মানব প্রেমিকের জীবন ভাষ্যই নয়, উচ্চ-সাহিত্যও বটে। প্রসঙ্গত, ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দের পূজার সময় নজরুল লিখেছিলেন 'আগমনী' কবিতা, যা প্রকাশিত হয় 'উপাসনা'র আশ্বিন সংখ্যায় এবং তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'য় গৃহীত হয়। ঠিক তার পরের বছর পূজার জন্য লিখেছিলেন 'আনন্দময়ীর আগমনে', যার সঙ্গে নজরুলের নিজস্ব কবিতা 'আগমনী' বা কমলকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগমনী' গানের কোনও সাযুজ্য ছিল না।

---

[১১০] স্বাগত, কাজী নজরুল ইসলাম।

[১১১] 'মারা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', কাজী নজরুল ইসলাম।

[১১২] নিষিধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

[১১৩] নিষিধ নজরুল, শিশির কর, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩।

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন তৎকালীন সদ্যপ্রকাশিত 'আনন্দবাজার' পত্রিকার জন্য, কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এটি ছাপাতে সাহস পায়নি, তাই ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রথমই প্রকাশ পায়; এরসঙ্গে 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ'ও আত্মপ্রকাশ করে, যার রচিয়তা ছিল ১১ বছর বয়সের একটি মেয়ে। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের [...] একটি ছোট বোন ছিল। এগারো বছর বয়স হবে। এ বয়সেই সে লিখতে পারতো। তার ছোট ছোট লেখা ধূমকেতুতে ছাপা হয়েছে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' ধূমকেতুর যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, সেই সংখ্যায় এই মেয়েটিরও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে একটি লেখা বার হয়েছিল। 'আনন্দময়ীর আগমনে'র সঙ্গে বাংলা সরকার এই লেখাটিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।'[১১৪] কবিতাটি হচ্ছে:

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,– আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?
[...]
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কর্ মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি!
হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর্ মা পুরুষ, রক্ত দে মা, রক্ত দেখা!
লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধাদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে।
[...]
বছর বছর এ-অভিনয় অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস্ আশিস কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে!
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস্, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা!
সেইদিন হবে জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজ্না, সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ময় ভূখা হুঁ'- মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাশ হতে গিরি-রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী![১১৫]

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা দেশপ্রেমে উদ্বেলিত। ইংরেজের বিরুদ্ধে এ এক অমর কবিতা-অগ্নি। দু'শ বছর ইংরেজ রাজত্বে এদেশে এর চেয়ে তীব্রতম কবিতা আর লেখা হয়নি। এই কবিতায় পুরাণের ব্যাপক প্রয়োগ থাকলেও সকল পাঠকই বুঝতে পারে যে, নজরুল ইংরেজ সরকার এবং দেশীয় রাজনীতিকদের ব্যঙ্গাত্মশেষে

[১১৪] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।
[১১৫] আনন্দময়ীর আগমনে, কাজী নজরুল ইসলাম।

তাদের আসল চেহারা উদঘাটন করেছিলেন। তিনি কবিতায় আনন্দময়ীকে আহবান করেছিলেন এই বলে যে, দেবী যেন মাটির ঢেলা ছেড়ে মুহূর্ত হয়ে উঠে নির্বীর্যদের শায়েস্তা করেন, ইংরেজকে নাশ করেন। এই কবিতা সংকলিত 'ধূমকেতু'কে বাজেয়াপ্ত না করে, এবং এই কবিতার রচয়িতাকে জেলে না ঢুকিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে আর কোনও উপায় ছিল!

৮ই নভেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ 'ধূমকেতু' অফিস তল্লাসী করে, আর প্রকাশক ও মুদ্রাকর আফজাল উল হককে গ্রেফতার করে। তখনই নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। এ-সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'কমরেড আবদুল হালীম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে 'ধুমকেতু' অফিসে গেলাম। আমরা তখন চাঁনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাতে ঘুমাতাম। ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত 'ধূমকেতু' অফিসে গিয়ে দেখলাম অত সকালেও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে 'ধূমকেতু'র জন্য লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিশ এসেছে 'ধূমকেতু'র অফিসে তল্লাসের পরওয়ানা ও কাজী নজরুলের নামে গিরেফতারী পরওয়ানা নিয়ে।'[১১৬]

গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হওয়ার পর কী হল, এ-সম্বন্ধে মুজফ্ফর আহমেদ লিখেছেন, 'নজরুল তখন সমস্তিপুরে গিয়েছিল বলে গিরেফতার হয়নি। পুলিশ আসার মুহূর্তের ভিতরে বীরেণবাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিশ প্রথমে নজরুলকে খুঁজলো। আমরা জানালাম তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন, তখন পুলিশ আমাদের গভর্নমেন্ট অর্ডার দেখালো যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' শীর্ষক একটি ছোট্ট লেখা বাজেয়াফৎ হয়ে গেছে। পুলিশ ওই সংখ্যার কপিগুলি নিয়ে যাবেন বললেন। তারপরে বাড়ীতে তল্লাসী হলো, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধূমকেতু' যে কয়খানা পাওয়া গেল তাই নিয়ে পুলিশ চলে গেলেন, আমাকে সার্চলিস্ট দিয়ে গেলেন।'[১১৭]

এরইমধ্যে নজরুল সমস্তিপুর থেকে কুমিলায় চলে আসেন, এখানেই তিনি ২৩শে নভেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সরকার উৎখাতের ইন্ধনদাতা হিশেবে কাজ করার অভিযোগে আবার মামলা হয়। বিচারপতি সুইনহোর আদালতে বিচার শুরু হয়। এই মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয় ২৯শে নভেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭ই জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট সুইনহো রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে নজরুলকে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ও ১৫৩-এ ধারানুসারে, এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; এই রায়ের ফলে ২৩শে নভেম্বর ১৯২২ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নজরুল অন্তরীণ হন। নজরুলকে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর, তারপর তাঁর অনশন, অনশন ভাঙার জন্যে রবীন্দ্রনাথের তারবার্তা প্রেরণ, বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে নজরুলের অনশনভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা একের-পর-এক ঘটে যায়। এ-সময়েই নজরুল তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন।

১৭ই জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট সুইনহোর আদালতে নজরুল যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাই হচ্ছে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামের নিবন্ধটি। এই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশ পায় আদালতে, রবিবার, দুপুর, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে; ম্যাজিস্ট্রেট ও অসংখ্য জনতার সম্মুখে; তারপর 'ধূমকেতু'র 'কাজী নজরুল সংখ্যা'তে প্রকাশিত হয় (২৭শে জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে)। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে নজরুল লিখেছেন,

[১১৬] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।
[১১৭] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী, আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোশামোদ করি নাই। প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারও পিছনে পোঁ ধরি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই। সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তার জন্য ঘরে বাইরে বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই। লোভের বশবর্তী হয়ে আত্মোপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই। নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়; সত্যের হাতের বাণী। আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। 'আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।'[১১৮]

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আত্মকথনমূলক নিবন্ধের সূচনা দেখলে মনে হয় তিনি রাজবেতনভোগী কর্মচারী রাজবিচারকে কাছে এই জবানবন্দী দিচ্ছেন; নিজের জবানবন্দী। এই নিবন্ধে নজরুলের মানস চিত্র ও তাঁর অন্ত রগূঢ় অভীসপ্ত স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর নান্দনিক চিন্তার দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে। এই নিবন্ধে তাঁর চেতনার ঊর্মিলার মাতঙ্গীরূপ, কষ্টকল্পিত নয় বরং স্বতঃস্ফুর্ত তরঙ্গের মত, প্রকাশ পায়। এতে পুরাণ ও ইতিহাস সঙ্কোচিত; ঐতিহ্যিক উপাদান এবং মানববোধের 'সত্য'-কে নজরুল ব্যঙ্গময় করে প্রকাশ করেছেন; তিনি লিখেছেন,

একাধারে রাজার মুকুট, আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি- অন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান [...]।[১১৯]

এখানে নজরুল সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক স্রষ্টাকেই চিত্রিত করেছেন। স্রষ্টার আইন– ন্যায়। সে আইনে কোনও ভেদাভেদ নেই। স্রষ্টার আইন সত্যের প্রকাশ। তাঁর দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকল সমান। তাঁর ভবনে রাজার মূকুট আর ভিখারীর সম্মান পাশাপাশি স্থান পায়। তাঁর আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট, যা সার্ব্বজনীন সত্য। নজরুল লিখেছেন,

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে– রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ, অর্থ; আমার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।[১২০]

ক্ষুদ্র বলতে নজরুল বোঝাতে চেয়েছেন অতি সাধারণ মানুষ বেতনভুগী রাজকর্মচারীকে, বিচারকও একজন রাজকর্মচারী, আর রাজবন্দী নজরুলের পেছনে আছে রুদ্র দেবতা শিব, তিনি যখন ধ্বংস-রূপে আবির্ভূত হন, তখন নৃত্যপাগল রুদ্র রূপ পরিগ্রহণ করেন, তিনি একইসঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রতীক-রূপক। নজরুলের রুদ্র একাধারে ঔপনিবেশিক রাজশক্তি ধ্বংস করবেন, তারপর আবার গড়বেন নতুনভাবে ভারতবর্ষকে। এই প্রেক্ষাপটে নজরুল চেতনার তীব্র প্রকাশ যেমন ঘটেছে 'বিদ্রোহী' কবিতায় তেমনি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তেও; এখানে বরং 'সত্য স্বয়ং' প্রকাশ পেয়েছে; যে-বাণী তিনি মনপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে কোনও অসত্যের আশ্রয় নিতে হয় না, প্রয়োজন পড়ে না কোনও মানুষের সহযোগিতা, বরং সত্যিকার মানুষ সত্যকে গ্রহণ করেই, কারণ এ-যে শাশ্বত সত্য। এক কথায় সেই চিরদিনের বাণীভাষ্যরূপই এখানে প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্গে নজরুল মানসও– সত্য আছে, ভগবান আছেন, কিন্তু নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের অন্ত নেই। আবার নজরুল বলেছেন,

বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে?[১২১]

---

[১১৮] রাজবন্দীর জবানবন্দী।
[১১৯] রাজবন্দীর জবানবন্দী।
[১২০] রাজবন্দীর জবানবন্দী।

নজরুল নিজেকে তুলনা করেছেন স্রষ্টার হাতের বীণারূপেও। একইসঙ্গে লিখেছেন,

> আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরদ্ধে করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে যন্ত্র যিনি বাজান, সে বাণীয় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাকে অবরদ্ধে করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর।[১২২]

নজরুল নিজেকে 'সত্য' বাহকরূপে চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশের অংশ, আর তাই তিনি স্বতঃস্ফুর্ত। এজন্যে তাঁর রুদ্রবাণী অবরুদ্ধ করার ক্ষমতা কেউ রাখে না। নজরুল মরতে পারেন, রাজাও মরতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা অমর, বিধাতার কোনও বিকাশ নেই, তাঁর বাণীও অমর, এই বানী প্রকাশে নীরব থাকা যায় না; নজরুল না করলেও অন্যের কণ্ঠে অবশ্যই ফুটে উঠবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্রষ্টার সত্য বাণী; এই যুক্তিতে নজরুল বলতে চেয়েছেন এই সত্য বাণী প্রকাশের জন্য তিনি দায়ী নন; তাই লিখেছেন,

> দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়, দোষ তাঁর– যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বাণী বাজান। [...] আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ-রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিল। এ ধ্বংস নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা।[১২৩]

রুদ্ররূপী শিবের কথাই এতে প্রকাশ পায়। ধূমকেতুর অগ্নিনিশান নিয়ে শিব স্বয়ং নেচে উঠেন; ধ্বংস নাচন যেন। এখানেও শিবনৃত্যকে নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা বলে চিহ্নিত করেন। নজরুল লিখেছেন,

> অমৃতের পুত্র আমি। [...] এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান।[১২৪]

নজরুল নিজেকে অমৃতের পুত্র বলে দাবী করেছেন। পুনরায় রুদ্র স্রষ্টার উল্লেখ দেখে মনে হয় 'রুদ্র' এই প্রবন্ধে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। কেননা, নজরুল মানসপ্রবাহটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামপন্থী হিশেবে চিত্রার্পিত। শোষক ব্রিটিশের ধ্বংস ছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে না; এ তিনি বিশ্বাস করেন। আর এ কারণেই নজরুল যুগসিক্ত চেতনায় স্মারক পথ নির্মাণ করে বাংলা ভাষা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উদিত হন। নজরুল এই প্রবন্ধে পুরাণ ব্যবহার করেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিশেবে। তিনি নিজের কৃত কাজকে সত্য ও ন্যায়কর্ম বলে চিহ্নিত করেন, যা মূলত স্রষ্টার কাজ, আবার স্রষ্টাই তাকে দিয়ে এই ন্যায়কর্ম করিয়ে নেন; কেননা অন্যায় অবিচার আর পরাধীনতা কোনো মানবধর্ম হতে পারে না, তাই তিনি বিনাশরূপী ধূমকেতুর শিখা হিশেবে নিজেকে প্রতীকিত করেন। তিনি জানেন ধূমকেতুতে যে আগুন আছে তা কোন প্রকার ভরতবর্ষের জমিনে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারলে ব্রিটিশ সাম্রজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই প্রবন্ধে নজরুল শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেননি; করেছেন সমাজ, জাতি ও দেশের বিরুদ্ধেও, সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ যেন। বিদ্রোহ, বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত যা তার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয় তারও বিরুদ্ধে।

'ধূমকেতু' ছাড়াও নজরুল বেশ কিছু পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আর এ পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত লিখেনও। যেমন– 'লাঙল'[১২৫], 'সেবক', 'বৈতালিক'[১২৬], 'মোসলেম ভারত'[১২৭], 'বিজলী'[১২৮] প্রভৃতি। এছাড়াও দেশবন্ধুর

---

[১২১] রাজবন্দীর জবানবন্দী।

[১২২] রাজবন্দীর জবানবন্দী।

[১২৩] রাজবন্দীর জবানবন্দী।

[১২৪] রাজবন্দীর জবানবন্দী।

[১২৫] টীকা: 'লাঙল'-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন নজরুল। সম্পাদক ছিলেন মণীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ডিক্লারেশন নম্বর ১৯২০; ৬ই নভেম্বর ১৯২৫। প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৫; এতে নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি স্থান পায়। 'লাঙল' পত্রিকার ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায় (১৫ই এপ্রিল ১৯২৬)। এরপর ১২ই আগস্ট ১৯২৬ থেকে 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। নতুন নামের এই পত্রিকায় অল্প-বিস্তর আরও নানারকম পরিবর্তন ঘটানো হয়। কিন্তু আগের মত এর লেখক-তালিকায় নজরুলের স্থান অপরিবর্তিতই থাকে। 'গণবাণী'র প্রচ্ছদে লেখা হয় যে, এ-হচ্ছে বাংলার কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র। কিন্তু গবেষকরা বলেছেন যে, 'লাঙল'-কে মুখপত্র করে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেই প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক ও সার্থক করে তোলা হয় মুজাফ্ফর আহ্মদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গণবাণী'-তে ।

'বাংলার কথা', 'সওগাত', 'নওরোজ', 'কলোল', 'গণবাণী', 'প্রগতি', 'বকুল', 'জয়তী' প্রভৃতি সমসাময়িক কাগজের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ছিল ।

নজরুলের 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি 'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৬শে আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে । ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি খুবই বিচলিত ও ক্ষব্ধ হয়ে জোরাল যে-কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'মন্দির ও মজজিদ' এদের একটি । এতে পরাধীন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের আত্মঘাতী যুদ্ধের দৃশ্য পরিহাসের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে । নজরুল লিখেছেন,

> "মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের!" আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে । প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল । আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম– তখন আর তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না । হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে– 'বাবা গো, মা গো!' মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে![১২৯]

নজরুল কোনও ধর্মকে নাকচ করেননি, বরং সহাবস্থান করেছেন । ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা যে এক নয়, একথাই তিনি বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন । ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় নজরুলের 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি । এতে তিনি লিখেছেন,

> একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমানের কথা উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঔ কথাটাই মনে হয় । সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় যে, এ ন্যাজ যাদের গজায় তা ভিতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক তারাই হয়ে ওঠে পশু ।[১৩০]

---

[১২৬] টীকা: 'বৈতালিক'-এর সম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক । ডিক্লারেশন নম্বর ১৭৫; ৩রা মার্চ ১৯২৯ । প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'বৈতালিক' নামে একটি কবিতা প্রকাশ হওয়ায় সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয় ।

[১২৭] টীকা:'মোসলেম ভারত'-এর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন কালাম মহম্মাদ সামসুদ্দিন । ডিক্লারেশন নং. ৩৪; ৩রা মার্চ ১৯২৯ ।

[১২৮] টীকা:'বিজলী'-র সম্পাদক ছিলেন সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । ডিক্লারেশনের তারিখ ২৯শে জুলাই ১৯২৪ ।

[১২৯] 'মন্দির ও মসজিদ', কাজী নজরুল ইসলাম ।

[১৩০] 'হিন্দু-মুসলমান', কাজী নজরুল ইসলাম ।

উপসংহার

নজরুলের আগে আর কোনও লেখক বাংলা প্রবন্ধে নিপীড়িত মানবাত্মার জন্য অকৃত্রিম, সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন কী না তা জানা নেই, তবে নজরুল যে দেখিয়েছিলেন তা অস্বীকার করা অসম্ভব। ' গণবাণী'তে নজরুল লিখেছেন,

> তোমার ব্যথা, তোমার ব্যর্থতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে জেগেছে। প্রতীচীর স্বার্থ মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে, মিসরের পিরামিড কেঁপে উঠেছে, চীনের প্রাচীরে ভাঙ্গন লেগেছে; হিমালয় দুলে উঠেছে। তোমার ব্যথার ভিতর দিয়ে সত্যের বাণী এসেছে: মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম অধিকার।[১৩১]

নজরুলের এই সম অধিকারের প্রত্যাশার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মিল থাকলেও তাঁর সাম্যবাদে কোনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সজ্ঞান সমর্থন ছিল কী না জানানি; তবে নজরুল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শোষিত মানুষের সংগ্রামের সপক্ষে স্বরাজের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'মুশকিল' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> মূক মৌনমুখে মুক্তির কলবর জাগিয়ে তুলতে হবে। সকল প্রকার মিথ্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ অকুত্রচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা চাই, আর তা না হলে শুধু ভদ্রলোকের জটলাতে স্বারাজের পাকা বুনিয়াদের প্রতিক্ষা হবে না- এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য চাই- এই অগণিত জনসাধারণ যাতে পূর্ণ-অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের সকল রকম অবিচার কদাচারের বিরুদ্ধে।[১৩২]

তৎকালীন ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তির যে প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে– সেখানেও নজরুলের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ' লাঞ্ছিত' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> দেশের যত লাঞ্ছিত, তাহাদের ব্যথাবুকে লইয়া মহাত্মা ভারতের শহরে শহরে ঘুরিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, 'কে আছো লাঞ্ছিত পতিত। ওঠো! জাগো! মুক্তি তোমার দয়ারে।'[১৩৩]

সাম্যের লক্ষ্যে, মানবতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নজরুলও গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, 'কে আছো পতিত, লাঞ্ছিত, কে আছো দীন হীন ঘৃণিত, এসো।'[১৩৪] নজরুলের এই আহবান শোনা যায় আরও প্রবন্ধে। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি জীবন এবং বেঁচে থাকাটাকে সবচেয়ে বড় ধর্ম হিশেবে উল্লেখ করেছিলেন। যে মানুষ দু'বেলা খেতে পারে না– দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে যায় বা নিজের ঘরে বিদেশীরা এসে মারতে থাকে– তাদের আবার ধর্ম কীসের? তাদের ধর্ম ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম; অন্যায় আর অবিচারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে নতুন করে বাঁচার চেষ্টাই ত তাদের ধর্ম। নজরুল তাঁর 'ধর্ম্মঘট' প্রবন্ধ লিখেছেন,

> চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনৎ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না; হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙটা ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা-জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারমাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন![১৩৫]

---

[১৩১] 'গণবাণী', ১৯২৭।
[১৩২] মুশকিল, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৩] লাঞ্ছিত, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৪] লাঞ্ছিত, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৫] ধর্ম্মঘট, কাজী নজরুল ইসলাম।

একই প্রবন্ধে নজরুল ঘরছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। আর সচেতন জনতাকে ডাক দিয়েছিলেন মানবতার অধিকার রক্ষা করার জন্যে সাম্যের পথে অস্ত্র তুলে নিতে। নজরুল লিখেছেন,

> ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে– তুমি কি বাঁচাবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভক্ত তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকতো? তারা কি দুশমন এলে কুরআন পড়তে ব্যস্ত থাকতো?[১৩৬]

নজরুলের এই ধর্মবিরোধিতা ধর্মের নান্দনিক আদর্শের বিরুদ্ধে নয়, এমনকী ইসলাম বিরোধও নয়, বরং তিনি ধর্ম ব্যবসায়ী শোষকদের আক্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ' লাঞ্ছিত' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> কেহ ধর্মের নামে, কেহ বা সমাজ, শান্তি ও শৃংখলার নামে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল। ফলে আজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইউরোপীয়গণ এশিয়া ও আপ্রিকার ধর্ম ও সমাজ শাসন করিতেছে। আবার আমাদের সমাজে কতকাল ধরিয়া মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চ জাতীয় নিু জাতির ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া তাহাদের পরলোকে সম্পত্তি করিতেছে।[১৩৭]

এই সম্পত্তি কর্তৃত্ব এবং অর্থের জন্যই পৃথিবীতে যত হানাহানি, মানুষে মানুষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণ– এসব নজরুল শুধু জানেনই না, এসব বিষয়ে মানুষের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ আহবানও ছিল; ঘোষণা ছিল বিদ্রোহ; প্রতিবাদ প্রতিরোধের আগুনে শোষকের বিশাল সিংহাসন পুড়িয়ে দেওয়ার কথাও ছিল; এমনকী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানুষের মানবতাহীনতা ও লুণ্ঠিত মানবাত্মার পতনে প্রতিবাদমুখর উচ্চারণ্ড ছিল। তিনি তাঁর 'লাঞ্ছিত' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> ঐ দেখ অত্যাচার তার সহস্র ফণা দোইয়া বিশ্বতরু গ্রাস করিতে উদ্যত, প্রাণে প্রাণে পদাহতা দেবতার তস্ত্রশ্বাস, ঘরে পীড়িতের ক্রন্দন। তুমি এ কালনাগকে পিষিয়া মারিতে পারিবে? তুমি কি বুকে বুকে আগুন জ্বালাইতে পারিবে?[১৩৮]

নজরুলের প্রবন্ধসমূহে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের অবিচল সমর্থনের কথা বিশেষভাবে হত-বা ব্যক্ত হয়নি। অনেকটা অস্থির ও বিলিষ্ঠভাবে কখনও ইসলামি চেতনায়, কখনও স্বরাজ আন্দোলনের সমর্থনে, কখনও-বা ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি মানবতা ও সাম্যের জয় গান গেয়ে উঠেছিলেন। 'আমার লীগ কংগ্রেম' প্রবন্ধে রাজনীতিকে অস্বীকার করে ও সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন নজরুল। তিনি লিখেছিলেন,

> মানুষের বিচারককে আমি স্বীকারও করি না ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক, আলাহ ও তার বিচারকেই মানি।[১৩৯]

এই প্রবন্ধে শুধু স্রষ্টাতেই আস্থা নয়; ইসলামি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে অগ্রগতির দিগে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান করেছিলেন। নজরুলের এই ধর্মবোধ এবং ভাববাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ' প্রতিভাষণেও। তবে নজরুল বলিষ্ঠভাবেই শোষণ-বঞ্চনার জাঁতাকলে পড়ে যেসব মানুষ আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের গুণকীর্তন করেছিলেন। তাদের জন্য সাম্যবাদকে মানবাত্মার মঙ্গলের সূচক হিশেবে নির্দেশ করেছিলেন। নজরুল 'লাঙল'-এ লিখেছেন,

---

[১৩৬] ধর্ম্মঘট, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৭] লাঞ্ছিত, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৮] লাঞ্ছিত, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৩৯] আমার লীগ কংগ্রেম, কাজী নজরুল ইসলাম।

> ব্রাহ্মণ পাদরিব রাজত্ব গিয়াছে। গুরু-পুরোহিত, খালিফা, পোপ নির্ববংশ- প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংলক্ত প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়- শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান আরম্ভ করলাম।[১৪০]

আর 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

> একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা'। [...] স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেরাই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কাররে অধীন নই, আমরা কাররে সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কত্রে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে, নৈলে নয়![১৪১]

মানবতাবাদী নজরুল সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীনতায় পৌঁছুতে,চেয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর পুরোমাত্মার বিশ্বাস। ফলে তিনি রাশিয়ার জাগরণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া জারমুক্ত হয়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়নি; ভেঙে যাওয়ার ত কোনও কথাই উঠতে পারে না। তুরস্কের সাড়া জাগানোর কথাও তিনি লিখেছিলেন, বিশেষ করে কামাল আতাতুর্কের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের কথা। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী দেশবাসির প্রত্যাশার কথাও। অর্থাৎ বিশ্বের অর্ধেক অঞ্চলে বিপ্লব দীক্ষা এবং পরাধীনতা, শোষণের বিরোধে প্রতিবাদ– অন্যায়-অবিচার আর মানব বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন– এসব বিষয় সম্বন্ধে নজরুল অবগত ছিলেন। সেই আলোকে ভারতবর্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নির্বীয় জাতিসত্তার মর্মমূলে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র হিশেবে তিনি দেখেছিলেন খেলাফৎ ও অসযোগ আন্দোলন দুটিকে। এসব বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অসযোগ আন্দোলনটি অকস্মাৎ স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন গান্ধী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এই রাজনৈতিক ব্যর্থতার পুরো দায় অবশ্যই মহাত্মা গান্ধীর উপর পড়ে। তারপরও নজরুল সশস্ত্র সংগ্রামের পথে দেশের স্বাধীনতা আসতে পারে এই বিশ্বাসে বিবর্তিত ছিলেন। তাঁর সম্যবাদী মানবপ্রবণতা সেই সাক্ষ্যই দেয়। নজরুল তাঁর 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজি' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি? পণ্ডিতজীর রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটার জলে ডোবার কথা। সে সংসার-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করলো; কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ও তেল চাইল। তেল-মাখা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে যুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়। [...] দেশের জনসাধারণের মাথা কচ্ছপের মতো শরীরের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন সেই মাথা বের করতে দেহটাকে কাটতে গেলে চলবে না। জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে। প্রতিদিনের যে অভাবে সে এমন হয়ে মরছে, জনসাধারণকে সেই অভাবের প্রতিকারের মধ্যে দিয়ে আবার সজাগ করতে হবে। [...] লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পল্লী-সংগঠনের আয়োজন করতে হয়– লাঙলের সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিক্ষার এত নিকট-সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না। তাই প্রজস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় সমস্ত নেতারা কি

[১৪০] লাঙল, প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা, ১লা পৌষ ১৩৩২।
[১৪১] মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা, কাজী নজরুল ইসলাম।

> করেন, আমরা দেখবার জন্য উৎসুক আছি। যারা বলেন স্বরাজ হলে ওসব ঠিক হবে– তারা গোড়াতেই ভুল করেন।[১৪২]

আর নজরুল কৃষক ও শ্রমিক সম্বন্ধে তাঁর 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজি' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> কৃষক ও শ্লমিককে সংঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়।[১৪৩]

সাম্যের এই বাণীতে সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্নের উচ্চারণ করেছিলেন। নজরুলের এই সাম্যবাদ আরও যুক্তি ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল 'গণবাণী' পত্রিকার মাধ্যমে, কমরেড মুজাফফর অহমদেকে আক্রমণ করে লেখা চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আক্তশক্তি'র জবাবপত্রে। সেখানে নজরুল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি সমর্থন ঘোষণা না করলেও সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন,

> কার্ল মার্কসের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তাদের মূল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়চ্ছেন।[১৪৪]

সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি নজরুলের দুর্বলতা বেশী দিন স্থির থাকেনি। এর প্রমাণ মিলে তাঁর 'বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও' প্রবন্ধে। 'আক্তশক্তি'র জবাবপত্র প্রকাশের ঠিক দশ বছর পর ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদেরই মাঝ থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ঈমান- দাঁড়াও তার পতাকাতলে তহরিমা বেঁধে। বলো আল্বাহু আকবার, হাঁকো হয়দারি হাঁক।'[১৪৫] অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত নজরুলের সাম্যবাদ, মানতবাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা স্রষ্টা তথা সৃষ্টিকর্তার বেদীমূলে স্থিত হয়ে ইসলামিক চেতনাসিক্ত প্রাবন্ধিক নজরুলকে আবিষ্কার করা যায়। তবুও একথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত যে, নজরুল দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক শোষণ-বাঞ্চনা, পরাধীনতা– এসব বিষয়েই সর্বরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন। তাই ত নজরুল তাঁর 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে নিজের মানবিক আচরণ ও মানবতার শান্তির জন্য মানুষের ভালবাসার মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। মানুষ হিশেবে সবাইকে তিনি সমান দেখেছিলেন, যা তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল পরিচয়। তিনি তাঁর ' আমার সুন্দর' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে। সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে।'[১৪৬] আর বনগাঁ সাহিত্য সভার 'অভিভাষণ'-এ বলেছিলেন, 'সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কী করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর।'[১৪৭]

[১৪২] পোলিটিকাল তুবড়িবাজি, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৪৩] পোলিটিকাল তুবড়িবাজি, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৪৪] নজরুলের একটি পত্র।
[১৪৫] বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৪৬] আমার সুন্দর, কাজী নজরুল ইসলাম।
[১৪৭] অভিভাষণ, বনগাঁ সাহিত্য সভা, ১৬ মার্চ ১৯৪১।